উর্বশী এথেন্স

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৯

URBASHEE ATHENS
A Bengali Travelogue on
Athens and its environs

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদসজ্জা ও বর্ণানুলেপ : ধীরেন শাসমল

প্রচ্ছদ পরিচিতি
সামনে, ওপরে—পার্থেনন মন্দির, অ্যাক্রোপলিস
নিচে—পার্থেনন মন্দিরের একখানি ফ্রিজ্
পেছনে—হাইড্রাদ্বীপে লেখক ও পার্থেনন মন্দিরেরপূর্বদিক, একটি কল্পিত চিত্র।

ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ
রাজা প্রিন্টার্স
২২/১ রাজচন্দ্র সেন লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রীকপুরাণের গল্প
হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রীসের ইতিহাস
নির্মলকান্তি মল্লিকচৌধুরী—গ্রীসের ইতিহাস
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ—ইলিয়াড-ওডিসি
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
Paul Mackendrick—The Greek Stones Speak
Sinclair Hood—The Home of Heroes
G. H. Kupfer—Legends of Greece & Rome
Francis Noel-Baker—The Land & People of Greece
Jack Lindsay—Helen of Troy
Richard Cavendish—Legends of the World
Robin Barrow—Athenian Democracy
W. S. Maguinness—The Civilization of Greece
Albert Cook—Myths & Language
Bruno D' Agostino—Monuments of Civilization—Greece
Pears' Encyclopaedia of Myths & Legends
Katerina Wilczynski—Homage to Greece
Francois Chamoux—The Civilization of Greece
E. Karpodini-Dimitriadi—Greece
K. Gouvoussis—Athens
Manolis Andronicos—Olympia
A. B. Tataki—Sounion
Arthur Frommer—Europe on 20 Dollars A Day
George Dontas—The Acropolis and Its' Museum

মনে পড়ছে সেই গল্পটির কথা, গ্রীক পুরাণের গল্প। নায়কের নাম পার্সিউস। আর তাঁর নামেই গল্পের নাম।···

কিন্তু পার্সিউসের কথা ভাবতে বসলে যে প্রশ্নটি প্রথম মনে আসে, আগে সেটির কথা বলে নিই। গ্রীক পুরাণের এই গল্পটির সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের এমন মিল হল কেমন করে?

পার্সিউসের মা রাজকুমারী ড্যানিকে তাঁর বাবা রাজা অ্যাক্রোসিয়াস কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন, যেমন দেবকীকে বন্দী করেছিলেন কংস। এবং তা একই কারণে। ডেলফি মন্দিরের পুরোহিত ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন—একমাত্র কন্যা ড্যানির পুত্রের হাতে পুত্রহীন রাজা অ্যাক্রোসিয়াসের অপমৃত্যু ঘটবে। আর শ্রীকৃষ্ণের মতো পার্সিউসেরও জন্ম সেই কারাগারে।

কেবল কৃষ্ণ আর পার্সিউসে নয়, গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি'-র সঙ্গেও আমাদের রামায়ণের বিস্ময়কর মিল রয়েছে। রাবণ যেমন সীতাহরণ করেছিলেন, তেমন ট্রয় রাজ্যের রাজপুত্র প্যারিস মেনেলাসের সুন্দরী স্ত্রী গ্রীসকন্যা হেলেনকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র যেমন লঙ্কা আক্রমণ করেছিলেন, আকিলিসের নেতৃত্বে গ্রীসবাসীরাও তেমন ট্রয় নগরী অবরোধ করলেন।

আবার ওদিসি মহাকাব্যে ট্রয়যুদ্ধের অন্যতম নায়ক ওদিসিউস দেশে ফেরার পথে দেবরোষে নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে বিশ বছর বাদে ভিখারীর বেশে যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁর স্ত্রী পেনিলোপি স্বামীকে চিনতে পারলেন না। তাই নিজের ফেলে যাওয়া ধনুকে গুণ পরিয়ে ওদিসিউসকে আত্মপরিচয় প্রমাণ করতে হল। এ যেন সীতাকে লাভ করার জন্য রামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গ।

যখন কলের জাহাজ কিংবা গাড়ি ছিল না, ছিল না বিমান বেতার ও দূরদর্শন, এমন কি কোন আন্তর্দেশীয় 'হাইওয়ে', তখন

কেমন করে এই মিলগুলি ঘটল ? অথচ কোথায় লঙ্কা আর কোথায় ট্রয়, কোথাকার ব্যাস-বাল্মীকি আর কোথাকার হোমার।

তাহলে কি আলেকজান্দার ভারতে যাবার আগের থেকেই হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে হেলেনীয়দের অর্থাৎ ভারতবর্ষের মানুষদের সঙ্গে গ্রীসদেশের মানুষদের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল ? কারণ আলেকজান্দার ভারতে যান খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ সালে আর ইলিয়দ এবং ওদিসি রচিত হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকে।

অনেকে বলেন, এই মিলগুলি নিতান্তই কাকতালীয়। তবে তাঁরাও স্বীকার করেন যে সেই আদি অতীতেও পৃথিবীর একপ্রান্তের মানুষদের সঙ্গে অপর প্রান্তের মানুষদের একটা ভাবগত ঐক্য ছিল ···।

কিন্তু যাক্ গে এসব ভাবনা। তার চেয়ে গল্পটির কথা মনে করা যাক। গ্রীক পুরাণের গল্প—পার্সিউসের গল্প।

আর্গস রাজ্যের রাজা অ্যাক্রোসিয়াসের মনে শান্তি নেই। তাঁর একমাত্র কন্যা ড্যানি (Danae) পরমাসুন্দরী হলেও তিনি পুত্রহীন। অশান্ত রাজা তাই পুত্র কামনা করতে ডেলফির মন্দিরে এলেন।

মন্দিরে প্রধান পুরোহিত রাজার কথা শুনে একটু মৃদু হাসলেন। তারপরে গম্ভীর স্বরে বললেন—পুত্রলাভের কোন আশা নেই তোমার। উপরন্তু ড্যানির পুত্রের হাতেই লেখা রয়েছে তোমার মৃত্যু।

সেকালে গ্রীসদেশে বড় বড় মন্দিরের পুরোহিতদের এইসব কথাকে বলা হত ভবিষ্যদ্বাণী। এবং গ্রীকদের ধারণা ছিল এসব বাণী মিথ্যে হবার নয়।

অতএব আর যায় কোথায়! ক্রুদ্ধ রাজা ফিরে এলেন রাজপুরীতে। রাজপ্রাসাদের একাংশে মাটির নিচে একটি ঘর তৈরি করালেন। ব্রোঞ্জ দিয়ে মুড়ে ঘরটিকে সুরক্ষিত করে তোলা হল।

তারপরে প্রাণভয়ে ভীত রাজা তাঁর প্রাণপ্রিয়া কন্যা ড্যানিকে সেই ঘরে বন্দী করে রাখলেন, যাতে ড্যানি কোনদিন কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসতে না পারেন।

সেই অন্ধ-কারাগৃহে কেবল একটি ছোট জানলা ছিল। জানলা দিয়েই কারারক্ষীরা ড্যানিকে খাদ্য ও পানীয় দিতেন। আর ঐ জানালা দিয়েই দিনে কিছু রোদ এবং চাঁদনী রাতে কয়েক ঝলক জ্যোৎস্না আসত সেই কারাগৃহে।

বলা বাহুল্য বন্দী রাজকন্যার চোখে ঘুম নেই। তিনি বসে বসে শুধুই কাঁদেন আর দেবরাজ জুপিটারের কাছে মুক্তি কামনা করেন।

এক অন্ধকার রাতে যখন কারারক্ষীরা সবাই পড়েছে ঘুমিয়ে, তখন সহসা আঁধার-কারা সোনালী আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

চম্‌কে উঠলেন রাজকন্যা। তারপরেই তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর প্রাণের আরাধ্য স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার সহাস্যে সামনে দাঁড়িয়ে।

অসহায় রাজনন্দিনী কেঁদে আকুল হলেন। দেবরাজ তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে পরম-স্নেহে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন।

বছর না ঘুরতেই সেই অন্ধ কারাগৃহে ড্যানির একটি পুত্র জন্ম-গ্রহণ করলেন। মা ছেলের নাম রাখলেন পার্সিউস।

খবর পেয়ে রাজা ছুটে এলেন কারাকক্ষে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় পেলি এই ছেলেটাকে ?

—এটি আমার দেবতার আশীর্বাদ বাবা! স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার এর জনক।

রাজা বিশ্বাস করলেন না মেয়ের কথা। কংস যেমন কৃষ্ণকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন, তিনিও তেমনি পার্সিউসকে মেরে ফেলতে চাইলেন। তবে একা নয়, সেই সঙ্গে নিজের মেয়েকেও।

মাঝারী আকারের একটি কাঠের সিন্দুক তৈরি করালেন অ্যাক্রোসিয়াস। তারপরে মেয়ে ও নাতিকে তার ভেতরে পুরে সিন্দুকটি সাগরে ভাসিয়ে দিলেন।

জুপিটারের করুণায় সিন্দুকটা ডুবে গেল না, ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছল সেরিফাস দ্বীপে। ডিকটিস নামে একজন জেলে তখন সাগরতীরে মাছ ধরছিলেন। সিন্দুকের ভেতরে মানুষের কান্না

শুনতে পেয়ে তিনি মা ও ছেলেকে উদ্ধার করলেন। ছেলেকে নিয়ে রাজকন্যা জেলের বাড়িতে এসে উঠলেন।

মা ও ধীবরদাদুর স্নেহে ও যত্নে বড় হতে থাকেন পার্সিউস। এক সময় শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন। ততদিনে রূপে ও গুণে, সাহসে ও শক্তিতে তিনি সারাদ্বীপে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছেন। হয়ে উঠেছেন সবার প্রিয়পাত্র। সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রশংসা রাজকন্যা ড্যানিরও। তাঁর রূপের খ্যাতিও দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে গিয়ে পৌঁচেছে।

কথাটা কানে এলো পলিডিকটিসের। সেই দ্বীপের রাজা। তিনি ড্যানিকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় পার্সিউস। তাঁকে সরাতে না পারলে রাজার কামনা পূর্ণ হবে না। তাই রাজা একদিন পার্সিউসকে তাঁর ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেন। দরিদ্র পার্সিউস কোন উপহার না নিয়েই উপস্থিত হলেন সেখানে। রাজা তাঁকে উপহাস করতে থাকলেন। সভাসদগণও রাজার সঙ্গে যোগ দিলেন। একসময় পার্সিউসের ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙে। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—বলুন, কি উপহার আপনার চাই ?

—মেডুসার মাথা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন রাজা। আগের থেকেই কথাটা ভেবে রেখেছিলেন তিনি।

—বেশ, তাই পাবেন। অঙ্গীকার করে পার্সিউস বেরিয়ে এলেন ভোজসভা থেকে। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হল, তখন বুঝতে পারলেন এভাবে প্রতিজ্ঞা করে আসা ঠিক হয় নি। এখন কেমন করে রক্ষা করবেন সে প্রতিজ্ঞা ? মেডুসা সম্পর্কে সামান্যই শুনেছেন তিনি। শুনেছেন পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে বৃদ্ধ অ্যাটলাস অনন্তকাল ধরে বিশ্বের বোঝা মাথায় করে রয়েছেন দাঁড়িয়ে, তারই কাছে রয়েছে এক জনহীন দ্বীপ। সেই দ্বীপের বাসিন্দা তিন গর্গন-ভগিনী (Gorgons) ভয়ঙ্করী রাক্ষুসী। তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে হিংস্র, তারই নাম মেডুসা (Medusa)।

মুখখানি তার সুন্দরী যুবতীর কিন্তু সে মুখে সংশয় অবিশ্বাস আর নিষ্ঠুরতা। তার ঠোঁট দুটিতে লেগে আছে মৃত্যু-যন্ত্রণা। তার চুলগুলি বিষধর সাপ, সর্বদা হিস হিস করছে। তার পিঠে দুটি বাজপাখির পাখা। তার বুকে তামাটে আঁশের বর্ম। কেবল তার চোখে কি আছে কেউ জানে না। কারণ সে চোখে চোখ পড়লেই মানুষ পাথর হয়ে যায়।

রাজা ভাবলেন, বাঁচা গেল! বোকাটা আর ফিরে আসবে না। কিছুদিন বাদেই ড্যানিকে ধরে এনে ভোগ করা যাবে।

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্সিউস এসে দাঁড়ালেন সাগর-তীরে। জুপিটারকে স্মরণ করে তিনি দেব-দেবীদের কৃপাভিক্ষা করলেন।

প্রার্থনা বিফল হল না। দেবী মিনার্ভা তাঁকে নিজের অজেয় ঢাল দান করলেন। ঢালটি দর্পণের মতো উজ্জ্বল। দেবতা প্লুটো দিলেন এক আশ্চর্য শিরস্ত্রাণ। সেটি মাথায় পরলেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। আর দেবদূত মার্কারি দান করলেন একখানি দুর্ভেদ্য তরবারি এবং একজোড়া জুতো। জুতো জোড়া পায়ে দিলেই ঝড়ের বেগে আকাশে বিচরণ করা যায়।

দেবী মিনার্ভা তাঁকে পথের খানিকটা হদিশও দিলেন। বললেন—তোমাকে প্রথম যেতে হবে উত্তর মেরুতে, সেখানে বাস করে মেডুসার আরও তিন বোন, তাদের একটি মাত্র চোখ। কিন্তু তারাই শুধু তোমাকে মেডুসার ঠিকানা দিতে পারে।

পার্সিউস তখন মার্কারির জুতো পায়ে দিলেন আর মাথায় দিলেন প্লুটোর শিরস্ত্রাণ। তারপরে একহাতে মিনার্ভার ঢাল ও আরেক হাতে মার্কারির তরবারি নিয়ে অদৃশ্য পার্সিউস আকাশ পথে ভেসে চললেন।

সাত সমুদ্র আর তেরো নদী পেরিয়ে পৌঁছলেন মেরুরাজ্যে, অনন্ত রাত্রির দেশে, যেদেশে এর আগে কোনদিন মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে নি। সেই চিরতুষারে সাতদিন পদচারণা করে পার্সিউস উপস্থিত হলেন এক নিস্তরঙ্গ সাগরতীরে। সেখানে সেই এক চোখ হাতে তিন বোন বসে আছে। তাদের একটি চোখ হলেও সে চোখে তারা ত্রিভুবন

দেখতে পায়। তবে তা একজন একজন করে। অর্থাৎ চোখটি যখন যার হাতে থাকবে, সেই কেবল দেখতে পাবে। বাকি দুজন তখন অন্ধ এবং চোখ পালটাবার সময়টিতে তিনজনেই দৃষ্টিহীন।

অদৃশ্য পার্সিউস সেই সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। এবং এক বোন যখন চোখটি আরেক বোনকে দিচ্ছে, তখন হাত বাড়িয়ে চোখটি নিজে নিয়ে নিলেন। ভুল বুঝে তিন বোন হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে।

পার্সিউস কথা বললেন। তারা বিস্মিত হয়ে চুলোচুলি থামিয়ে দিল। পার্সিউস বললেন—তোমাদের চোখটি এখন আমার হাতে। গর্গন-ভগ্নীরা কোথায় থাকে, তা না বলে দিলে আমি তোমাদের এটি ফেরত দেব না।

বাধ্য হয়ে অন্ধ বৃদ্ধাদের বলতে হল গর্গনদের ঠিকানা। পার্সিউস তখন সেই চোখ দিয়ে জায়গাটি এবং সেখানে যাবার পথ ভাল করে দেখে নিয়ে, চোখটি তাদের ফেরত দিলেন।

তারপরে রওনা হলেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। আবার তেমনি সাগর নদী আর পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছলেন প্রাণহীন এক দ্বীপে। সেখানে দিন-রাত্রি নেই, নেই কোন গাছপালা। থাকবে কেমন করে? মেডুসার মৃত্যুদৃষ্টিতে যে সবই পাথর হয়ে গিয়েছে।

কেবল আছে মেডুসা ও তার দুই বোন—তিন রাক্ষসী। অদৃশ্য পার্সিউস দেখতে পেলেন তাদের, তারা ঘুমিয়ে রয়েছে। সুবর্ণ সুযোগ বুঝতে পেরে পার্সিউস এগিয়ে এলেন মেডুসার কাছে। অদৃশ্য হলেও তিনি তার দিকে তাকালেন না। কারণ তার চোখে চোখ পড়লেই তিনি পাথর হয়ে যাবেন। তিনি মিনার্ভার ঢালটিকে আয়না করে নিয়ে ঢালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মেডুসার একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপরেই মার্কারির তরবারি দিয়ে এক কোপে মেডুসার গলা কেটে ফেললেন।

মেডুসার বোনদের ঘুম গেল ভেঙে। কিন্তু তারা কিছু করতে পারার আগেই পার্সিউস মেডুসার মাথাটি একটা থলির ভেতরে ভরে নিয়ে আকাশে উঠে এলেন। দুই বোন মাটিতে দাঁড়িয়ে বৃথাই

আস্ফালন করতে থাকল।

মেডুসার মাথা নিয়ে পার্সিউস মহানন্দে আকাশপথে উড়ে চললেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সহসা ঝড় উঠল। বাধ্য হয়ে তাঁকে নেমে আসতে হল মাটিতে, দৈত্যরাজ অ্যাটলাসের প্রাসাদে। পার্সিউস তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন।

সৃষ্টির বিশালতম দেহী দৈত্যরাজ অ্যাটলাস। বিশ্বের পশ্চিমতম প্রান্তে বাগান ঘেরা সুবিশাল প্রাসাদ তাঁর। হীরা মুক্তো মাণিক্যের প্রাসাদ আর সোনার গাছের বাগান। তাঁর বড় ভয় চোর এসে মণি-মাণিক্য আর সোনার আপেল চুরি করে নিয়ে যাবে।

তাই পার্সিউসকে দেখে তিনি গেলেন ক্ষেপে।

সবিনয়ে পার্সিউস বললেন—আমি দেবরাজ জুপিটারের ছেলে, আমি চোর নই। আমি মেডুসাকে বধ করে দেশে ফিরছি, আমি একটি রাতের জন্য আপনার আশ্রয়প্রার্থী।

অ্যাটলাস বিশ্বাস করলেন না তাঁর কথা। পার্সিউস বহু অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু অ্যাটলাসের সেই এক কথা—তুমি এই মুহূর্তে আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও!

—কেমন করে যাই বলুন, বাইরে প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে।

—তা হোক গে! তুমি বেরোও, বেরোও বলছি!

এবারে রেগে গেলেন পার্সিউস। তিনি থলিটা খুলে মেলে ধরলেন অ্যাটলাসের দিকে। সেদিকে তাকানো মাত্রই অ্যাটলাস পাথর হয়ে গেলেন।

ভূমধ্য সাগর আর আতলান্তিক মহাসাগরের সঙ্গমে সুবিরাট একটি পাহাড় হয়ে আজও তিনি রয়েছেন দাঁড়িয়ে। পাহাড়টির নাম মাউন্ট অ্যাটলাস।

রাজাহীন রাজবাড়িতে রাত কাটিয়ে পার্সিউস পরদিন সকালে আবার আকাশচারী হলেন। উড়ে চললেন দেশের দিকে। তিনি লিবিয়ার মরুভূমি পার হয়ে ইথিওপিয়ার আকাশে এলেন। আর তখুনি তাঁর নজর পড়ল নিচে। দেখতে পেলেন, সাগরতীরে টিলার

ওপরে অপরূপা একটি যুবতীকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। মেয়েটি কাঁদছে। আর টিলার নিচে দাঁড়িয়ে আছে শত শত নারী-পুরুষ। কাঁদছে তারাও। কিন্তু কেউ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসছে না।

বিচলিত পার্সিউস নেমে এলেন মেয়েটির সামনে। তিনি তাঁর রূপ দেখে মোহিত হলেন। কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কে তুমি? তোমার মতো মেয়েকে কারা এভাবে বেঁধে রেখেছে বলো, আমি এখুনি তাদের হত্যা করব।

মুখ তুললেন মেয়েটি। চোখ মুছে পার্সিউসের দিকে তাকালেন। সহায়হীনা যেন সহায় খুঁজে পেলেন। মরণের মুখে দাঁড়িয়ে আবার বাঁচার আশায় অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন —আমার নাম অ্যাণ্ড্রোমেডা (Andromeda) এই দেশের রাজা সেফিউস আমার বাবা আর রূপসী রানী ক্যাসিওপি আমার মা। আমার অহঙ্কারী মা একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিল, সে নাকি জলপরীদের (Nymphs) চেয়েও সুন্দরী। কথাটা শুনে সাগরদেব নেপচুন ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছেন। তিনি বার বার একটা সমুদ্র-দৈত্যকে (Serpent) এ দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিবার দৈত্যটা এসে দেশ ছারখার করে যাচ্ছে। অবশেষে ঠিক হয়েছে এই দেশের সবচেয়ে সুন্দরী যুবতীকে পেলে দৈত্যটা খুশি হয়ে চলে যাবে। তাই আমার দেশবাসীরা আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছেন। এখুনি হয়তো দৈত্যটা আমাকে নিতে সাগর থেকে উঠে আসবে। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান এখান থেকে।

—না। গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন পার্সিউস—দেবরাজ জুপিটার আমার বাবা, রাক্ষসী মেডুসাকে বধ করেছি আমি। সেই সমুদ্র-দৈত্যটাকে বধ করে তোমাকেও উদ্ধার করব আমি। আগে বলো, তোমাকে মুক্ত করতে পারলে তুমি আমার হবে?

মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। পার্সিউসের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

তারপরে কোমল কণ্ঠে বললেন—আমি সারাজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকব।

—বেশ, এবারে বলো তোমার বাবা-মা কোথায়! আমি তাঁদের সঙ্গেও একবার কথা বলে নিতে চাই।

অ্যাণ্ড্রোমেডা নিচের অপেক্ষমাণ জনতার মধ্যে তাঁর বাবা ও মাকে দেখিয়ে দিলেন। পার্সিউস টিলা থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন রাজার সামনে। তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমি যদি দৈত্যটাকে বধ করে আপনার মেয়ের জীবনরক্ষা করতে পারি, তাহলে কি তাকে আমি স্ত্রী রূপে পেতে পারি?

—নিশ্চয়ই! রাজা ও রাণীর সঙ্গে সমবেত দেশবাসীও সোচ্চার স্বরে অঙ্গীকার করলেন।

আর ঠিক তখুনি সাগর তোলপাড় করে সাগর থেকে সেই দৈত্যটা উঠে এলো তীরে। সে টিলা বেয়ে উঠতে থাকল ওপরে, যেখানে অপরূপা অ্যাণ্ড্রোমেডাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্সিউস আকাশে উঠলেন। তিনি দৈত্যটার দিকে উড়ে চললেন। তার দেহের ছায়া পড়ল দৈত্যের গায়ে। নির্বোধ দৈত্য সেই ছায়াকেই ধরতে চাইল।

পার্সিউস তরবারির আঘাতে দৈত্যটার ডান হাত কেটে ফেললেন। সমবেত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। অ্যাণ্ড্রোমেডার মুখে ফুটে উঠল হাসি।

যন্ত্রণাকাতর দৈত্য বাকি হাতখানি দিয়েই পার্সিউসকে ধরার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। কিন্তু পেরে উঠল না। সুকৌশলে তার ধরা-ছোঁয়ার ওপরে থেকে পার্সিউস তার পিঠে ক্রমাগত আঘাত হানতে থাকলেন। দৈত্যের রক্তে সাগরের জল লাল হয়ে গেল। তার হুঙ্কারে যেন ঝড় বইতে লাগল।

সমবেত জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই সংগ্রাম দেখতে থাকলেন। অ্যাণ্ড্রোমেডা ভয়ে চোখ বুঝলেন। এবং পার্সিউস অবশেষে মার্কারির অমোঘ তরবারিখানি সবেগে বসিয়ে দিলেন দৈত্যটার বুকে। তার

নিষ্প্রাণ দেহটা টিলার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

জনতার জয়োল্লাসে সাগরসৈকত মুখরিত হয়ে উঠল। অ্যাণ্ড্রোমেডা চোখ মেললেন। দেখতে পেলেন ক্লান্ত পার্সিউস তার সামনে দাঁড়িয়ে। আনন্দ আর উত্তেজনায় তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।

শেকল খুলে অ্যাণ্ড্রোমেডাকে মুক্ত করলেন পার্সিউস। হাত ধরাধরি করে দুজনে নেমে এলেন রাজা ও রাণীর কাছে। তাঁরা তাঁদের বুকে টেনে নিলেন।

কয়েকদিন বাদেই মহাসমারোহে শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হল। পার্সিউসকে সিংহাসন গ্রহণ করতে বললেন বৃদ্ধ রাজা। কিন্তু তিনি সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন—আমার আরব্ধ ব্রত শেষ হয় নি এখনও। তাছাড়া আমাকে আমার দুঃখিনী মায়ের কাছে যেতে হবে ফিরে।

ইথিওপিয়ার সাগরতীরে পার্সিউস কিছুদিন মধুচন্দ্রিমা যাপন করলেন। তারই মধ্যে তিনি সেখানে মিনার্ভা, মার্কারি, প্লুটো এবং জুপিটারের মন্দির তৈরি করিয়ে নিয়মিত সেবা-পূজার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তারপরে সস্ত্রীক পার্সিউস রওনা হলেন দেশে, সেরিফাস দ্বীপে। এবারে আর আকাশপথে নয়, রাজার জাহাজে। সঙ্গে তাঁর রাজকন্যা আর নানা উপঢৌকন ও দাস-দাসী।

দুষ্টুরাজা পলিডিকটিস অনেক আগেই ভেবে নিয়েছিলেন পার্সিউস মারা গেছেন কিম্বা মেডুসার অভিশপ্ত দৃষ্টিতে পাথর হয়ে আছেন। আর তাই তিনি ড্যানির ওপরে হামলা শুরু করেছিলেন। অতিষ্ঠ হয়ে অসহায়া ড্যানি মিনার্ভার মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পলিডিকটিস তাঁকে হরণ করবার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছেন।

বউ নিয়ে বাড়িতে এলেন পার্সিউস। পালকপিতা মহ ডিকটিস আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন পৌত্রকে। সানন্দে সুন্দরী বধূকে বরণ করলেন। তারপরে পার্সিউসকে শয়তান রাজার কুকর্মের কথা বললেন।

অ্যাণ্ড্রোমেডাকে ঘরে রেখে মেডুসার মাথা সহ থলিটা কাঁধে

নিয়ে ক্রুদ্ধ পার্সিউস রাজসভায় এলেন। রাজা তাঁকে দেখে খুবই অবাক হলেন। হয়তো বা একটু ভয়ও পেলেন। কিন্তু স্বাভাবিক স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছো পার্সিউস? কি খবর তোমার?

শান্ত স্বরে পার্সিউস উত্তর দিলেন—ভাল মহারাজ, খুবই ভাল। আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি।

—মানে?

—আমি মেডুসাকে বধ করেছি।

—মিথ্যেবাদী! ক্ষিপ্ত কণ্ঠে রাজা চিৎকার করে উঠলেন—কোথায় তার মাথা?

—এইযে! এই থলির ভেতরে! পার্সিউস থলিটা রাজার সামনে রেখে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

রাজা সেখানে বসে পড়ে তাড়াতাড়ি থলিটার মুখ খুলে ভেতরে কি আছে দেখতে গেলেন। এবং বলা বাহুল্য দুষ্টুরাজার পাপের বোঝা পূর্ণ হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেলেন।

সভাসদ ও রাজকর্মচারীগণ মুক্তির আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। পার্সিউসের জয়ধ্বনিতে রাজসভা মুখরিত হয়ে উঠল। তাঁরা তাঁকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। ততক্ষণে অ্যাণ্ড্রোমেডাকে নিয়ে ডিকটিস সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। পার্সিউস পালকপিতা মহৎ ডিকটিসের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। উপস্থিত সভাসদগণ ধন্য ধন্য করে উঠলেন।

নতুন রাজা ও অ্যাণ্ড্রোমেডাকে নিয়ে পার্সিউস ছুটে এলেন মিনার্ভা মন্দিরে। মাতা ও পুত্রের মিলন হল। পুত্রবধূ পেয়ে মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন।

তারপরে পার্সিউস সেই মন্দিরে দাঁড়িয়ে তাঁর ইষ্ট দেব-দেবীকে স্মরণ করলেন। ভক্তকে দর্শন দিলেন তাঁরা। প্লুটোকে শিরস্ত্রাণ আর মার্কারিকে তলোয়ার ও জুতো ফিরিয়ে দিলেন পার্সিউস। তারপরে ঢালসহ মেডুসার মাথাটিকে মা-মিনার্ভার পায়ের কাছে

রাখলেন। দেবী তখন মাথাটিকে ঢালের মাঝখানে বসিয়ে নিলেন।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। কেবল বলতে হত—রাজা ডিকটিস পার্সিউসকে তাঁর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং রাজার মৃত্যুর পরে দেশবাসী পার্সিউসকে রাজপদে বরণ করে নিলেন। অ্যাণ্ড্রোমেডা ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রাজা পার্সিউস সুখে রাজত্ব করতে থাকলেন। অথবা ঠাকুরমার ঝুলির ভাষায় 'নাতি-নাতকুড় লইয়া কোটী-কোটীশ্বর হইয়া যুগ যুগ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।'

গ্রীক পুরাণকে যিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত করিয়েছেন, সেই কুপারসাহেবও কিন্তু প্রায় এভাবেই এই গল্প শেষ করেছেন। তাঁর ভাষায়—

'After that Perseus took his wife to his island home, and there they spent many happy days together in his mother's cottage.*

কিন্তু না, মূল গল্পটি এখানেই শেষ নয়, আরও এগিয়ে গিয়েছে। আর তা না এগোলে সত্যি গল্পটা শেষ হয় না। আমি বসে বসে সেই শেষটুকুর কথাই ভাবতে থাকি।

বীর পার্সিউসের নাম তখন দেশে দেশে পড়েছে ছড়িয়ে। কিন্তু খ্যাতির প্রতি কোন মোহ নেই তাঁর। একদিন তিনি মাকে বলে বসলেন—চলো, এবারে আমরা দাদুর দেশে ফিরে যাই।

মা আপত্তি করলেন। তাঁর ভয়, পিতা অ্যাক্রোসিয়াসের আক্রোশ তখনও স্তিমিত হয় নি।

পার্সিউস তাই মাকে বোঝাতে থাকেন—দাদু এতদিনে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাছাড়া আমার নাম-ডাক শুনে তিনি নিশ্চয়ই আমার পথ চেয়ে বসে রয়েছেন।

* 'Legends of Greece and Rome' by Grace H. Kupfer, First published in 1897

অবশেষে রাজি হলেন মা। ছেলে-বউকে নিয়ে তিনি দেশের পথে রওনা হলেন।

খবরটা অ্যাক্রোসিয়াসের কানে এলো। তিনি প্রমাদ গণলেন। ভাবলেন, এবারে যম আসছে। প্রাণভয়ে ভীত রাজা দেশত্যাগী হলেন।

দেশের পথে পার্সিউস পৌঁছলেন ল্যারিসা নামে এক নগরীতে। শুনলেন সেখানে শক্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। দেশ-দেশান্তর থেকে বহু বীর সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন। আত্মপরিচয় গোপন করে পার্সিউসপ্রতিযোগিতায় সামিল হলেন।

দর্শকবৃন্দ তাঁর সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহ দেখে পুলকিত হলেন। তারপরে তিনি যখন একের পরে এক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকলেন, তখন সবাই তাঁর জয়ধ্বনিতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

অবশেষে এলো শেষ প্রতিযোগিতা—লোহার বল ছোঁড়া। বলটা খুবই ভারি। কারও গায়ে পড়লে মৃত্যু অবধারিত।

যথাসময়ে পার্সিউসের পালা এলো। তিনি সজোরে বল ছুড়লেন। ময়দান পার হয়ে বলটা গিয়ে পড়ল দর্শকাসনে, জনৈক বৃদ্ধ দর্শকের মাথায়। হতভাগ্য দর্শক ততক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

সংবাদ পেয়ে মর্মাহত পার্সিউস ছুটে এলেন দর্শকদের মাঝে। সঙ্গে তার মা ও অ্যাণ্ড্রোমেডা।

মৃত বৃদ্ধকে দেখেই মা চিৎকার করে উঠলেন—এ তুই কি করলি পার্সিউস! শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি তুই বাবাকে মেরে ফেললি!

পার্সিউস আসছে শুনে প্রাণভয়ে ভীত অ্যাক্রোসিয়াস পালিয়ে ল্যারিসায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শক্তি পরীক্ষার কথা শুনতে পেয়ে তিনি এসেছিলেন এখানে, বসেছিলেন দর্শকাসনে। কিন্তু 'মারে কৃষ্ণ রাখে কে?' শেষ পর্যন্ত দৌহিত্রের হাতেই তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হল। এবং এইভাবে সত্য হল ডেলফির ভবিষ্যদ্বাণী।

মাতামহের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করে পার্সিউস আর্গস রাজ্যে এলেন। আর্গসবাসীরা পরম সমাদরে বরণ করলেন তাঁদের। তাঁরা পার্সিউসকে রাজা করতে চাইলেন!

কিন্তু অনুতপ্ত পার্সিউস সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। জনৈক আত্মীয়কে আর্গসের সিংহাসনে বসিয়ে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি টাইরিন্‌স নগরে চলে এলেন। অদূরে মাইকেনি নামে এক নতুন নগরীর পত্তন করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকলেন। গ্রীক সভ্যতার অন্যতম স্মৃতিকাগার রূপে আজও মাইকেনি প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি শ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র।

দুই

লাল আলোদুটি আবার জ্বলে উঠেছে। শুধু লাল নয়, ছবিযুক্ত লাল আলো। একটি সিটবেল্ট বাঁধার, অপরটি ধূমপান নিষেধের নির্দেশ!

গ্রীকপুরাণের যুগ থেকে জেট বিমানের যুগে ফিরে আসি। ঘড়ির দিকে তাকাই। বেলা দুটো বাজতে পাঁচ।

তার মানে প্রায় পৌনে তিনঘণ্টা হল রোম থেকে আমাদের বিমান ছেড়েছে। আধুনিকতম বিমান—ডি. সি. টেন।

এথেন্স এসে গেল। রোম থেকে এই বিমানে এথেন্স আসতে দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে। য়ুরোপ ভ্রমণ শুরু করার পরে এটি আমার দীর্ঘতম বিমানযাত্রা। কারণ জুরিখ থেকে লণ্ডন যেতে দেড়ঘণ্টা লেগেছে, লণ্ডন থেকে পারি চল্লিশ মিনিট, পারি থেকে ডুসেলডর্ফ পঞ্চান্ন মিনিট, ডুসেলডর্ফ থেকে বার্লিন একঘণ্টা, বার্লিন থেকে কোলন একঘণ্টা পাঁচ মিনিট, কোলন থেকে জুরিখ একঘণ্টা আর জুরিখ থেকে রোম আসতে লেগেছিল একঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। আজ সেখানে রোম থেকে এথেন্স আসতে লাগল প্রায় তিনঘণ্টা।

হ্যাঁ, এ যাত্রায় আমার য়ুরোপ ভ্রমণের শেষ শহর এথেন্স। উর্বশী এথেন্স দর্শন শেষে শেষ হবে আমার য়ুরোপ ভ্রমণ। এখান থেকে আমি সোজা দেশে ফিরব।

কিন্তু দেশের কথা এখন নয়, তার চেয়ে বিদেশ-ভ্রমণের কথাই ভাবা যাক, আজকের এই বিমানযাত্রার কথা। এবার বিদেশে এসে আমি বিভিন্ন দেশের বিমানে চড়েছি। যেমন এয়ার-ইণ্ডিয়া, সুইস-এয়ার, বৃটিশ এয়ারওয়েজ, এয়ার-ফ্রান্স, এ্যালিটালিয়া এবং এই ওলিম্পিক এয়ারওয়েজ। বিমানগুলির আকার ও গড়ন এক নয়। কোনটি বোয়িং-৭৪৭, কোনটি এয়ার বাস আবার কোনটি বা এই ডি. সি. টেন। কিন্তু সবগুলিরই ক্ষিপ্রগতি। যেমন বিলাসবহুল. তেমনি তাঁদের যাত্রী পরিষেবা। যেমন আদর-যত্ন, তেমনি খাওয়াদাওয়া।

যাক্ গে, যেকথা ভাবছিলাম। পৌনে তিনঘণ্টা আগে ওলিম্পিক এয়ারওয়েজ-এর এই ডি. সি. টেন বিমানখানি রোমের লে অনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দর থেকে আকাশে উঠেছে। একটু বাদেই এথেন্স বিমানবন্দরে অবতরণ করব। এখন সুনীল সাগরের ওপর দিয়ে বিমান চলেছে। সাগর নয় উপসাগর, নাম স্যারোনিক (Saronic) গাল্ফ। এটি Mediterranean Sea বা ভূমধ্যসাগরের অন্তর্ভুক্ত।

এখন আমাদের বিমানখানি নিচে নামছে। সাগর তীরে নোঙর করা শত শত ছোট-বড় জাহাজ আর বন্দর এলাকা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বন্দরের নাম পাইরিউস (Piraeus)। এটি একটি পৃথক শহর।

কিন্তু বন্দর নয়, আমি দেখছি জাহাজ। অসংখ্য জাহাজ। গ্রীস পৃথিবীর প্রাচীনতম নৌশক্তি। খ্রীঃ পূর্ব ৪৮০ অব্দে গ্রীস নৌবাহিনী পারস্য নৌবহরকে বিধ্বস্ত করেছিল। আজও গ্রীসের অর্থনীতি নৌবাণিজ্যের ওপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শুনেছি বর্তমান গ্রীসের সহস্রাধিক বাণিজ্য জাহাজ রয়েছে এবং তারা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন মাল পরিবহণ করতে পারে। আর তাই বোধকরি মার্কিন রাষ্ট্রপতির যুবতী বিধবা বৃদ্ধ গ্রীক নাবিকের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেন।

তাহলেও যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা যাই হোক, এখানে কিন্তু গ্রীসের কোন যুদ্ধ-জাহাজ দেখতে পাচ্ছি না। যে কয়খানি যুদ্ধজাহাজ দেখছি, সবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। উড্ডীয়মান পতাকাগুলো জানিয়ে দিচ্ছে—

'U. S. A. rules the world.'

এটি বিংশ শতাব্দীর নতুন সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্য দেখে এসেছি বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গে, দেখে এসেছি জর্মনি ও ইতালিতে, দেখছি এখানেও। এবং তা এথেন্স মহানগরীতে অবতরণ করার আগেই।

অবশেষে এথেন্স বিমানবন্দরে অবতরণ করা গেল। সাগরতীরে বিমানবন্দর। শুনেছি ফেলিরো (Faliro) এবং গ্লাইফাদা (Glyfada) নামে দুটি বেলাভূমির মাঝখানে অবস্থিত এইবিমানবন্দর।

সারি বেঁধে নেমে-আসি বিমান থেকে। জুরিখের মতো সুসজ্জিত কিম্বা হিথ্‌রোর মতো বিশাল বিমানবন্দর নয়। তাহলেও বেশ বড় আর ছিমছাম। ব্যবস্থাও ভাল। বিমান থেকে সোজা টার্মিনালে চলে এলাম, সিঁড়ি ভাঙা কিম্বা বাসে চড়ার ঝামেলা পোহাতে হল না। এবং বিনা বাক্যব্যয়ে কাস্টমস ও সিকিউরিটির পালা চুকল। স্যুটকেস পেতেও দেরি হল না।

একটা ট্রলিতে স্যুটকেস চাপিয়ে লাউঞ্জেও আসি। বিদেশ ভ্রমণের যা নিয়ম, তাই করি। এক্সচেঞ্জ কাউণ্টারের সামনে এসে থামি। ১০০ মার্কিন ডলার দিয়ে ৬০০০ দ্রাশমাস (Drachmas : Drs.) বা গ্রীসদেশের টাকা পেয়ে যাই। তার মানে ষাট দ্রাশমাস এক ডলারের সমান। তবু ভাল, রোমে নেমে একশ' ডলারের বিনিময়ে দেড় লক্ষ লিরা (Lire) বা ইতালীয় টাকা পেয়েছিলাম। আর বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছতেই তার মধ্যে ৪৮০০০ লিরা ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয়েছিল। অর্থাৎ মূল্যমান বুঝে নিয়ে চলাফেরা করা একটা রীতিমত গবেষণা সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। এখানে আশা করছি কাজটা কিঞ্চিৎ সহজ হবে।

একস্‌চেঞ্জ কাউণ্টার থেকে হোটেল রিজার্ভেশানে আসি। রোমের হোটেল ম্যানেজার যেমন আমার পকেট কেটেছেন, তেমনি সেবাও করেছেন। তিনি আমাকে রোম দর্শনে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। আসার সময় সাত ডলারের মতো ট্যাক্সিভাড়া বাঁচিয়ে

দিয়েছেন এবং ফোন করে ওলিম্পিক এয়ারওয়েজ মারফত এথেন্সে হোটেল রিজার্ভ করিয়েছেন।

হোটেল রিজার্ভেশানে এসে সেকথা বলতেই মেয়েটি আমার টিকেট ও পাসপোর্ট দেখে নিয়ে কম্পিউটার-কে জিজ্ঞেস করে। সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার হোটেলের নাম ও ঠিকানা বলে দেয়। বেরিয়ে আসে একটুকরো কাগজ। মেয়েটি সেটুকু আমার হাতে দেয়। দেখি লেখা রয়েছে—

'HOTEL STANLEY. I ODYSSEOS STR.
KARAISKAKI SQU. ATHENS 107
TEL. 5220.011—5220.014'

মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে। ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে আসি। প্রথম ট্যাক্সিখানার সামনে আসতেই ড্রাইভার গলা বাড়িয়ে বলেন—গুড আপ্‌তারনুন্‌ স্যার!

আমি কাগজটুকু তাঁর হাতে দিই। তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসেন গাড়ি থেকে। ট্রলি থেকে স্যুটকেস নিয়ে গাড়ির পেছনে রেখে দেন। তারপরে হ্যাণ্ডব্যাগটি আমার হাতে দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বলেন—দয়া করে ভেতরে বসুন!

ট্রলিটা পড়ে থাকে পথের ধারে। না। ওটা কেউ চুরি করবে না। বিমানবন্দরের লোক এখান থেকে নিয়ে গিয়ে রেখে দেবে। এসব দেশের কোন মানুষ কখনও জাতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন না।

গাড়ি এগিয়ে চলে। আমার পিতৃপ্রতিম পাঠক শ্রীভগবতীপ্রসাদ খৈতান ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রদীপকুমার খৈতানের আনুকূল্যে আরেকটি স্বপ্নও সত্য হল।* আমি আজ সত্যই গ্রীসে এসেছি। এগিয়ে চলেছি উর্বশী এথেন্সের দিকে।

বিমানবন্দর থেকে মহানগরী মাত্র ১০ কিলোমিটার। যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি ছাড়াও রয়েছে সিটি বাস এবং ওলিম্পিক এয়ারওয়েজ-এর বাস। কাচের ছাদ সহ চারিদিক কাচে ঘেরা বিমান কম্প্যানির

* লেখকের 'জয়ন্তী জন্নরিখ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

বাসগুলি অবশ্য শুধুই নিজেদের যাত্রী পরিবহন করে। ভাড়া বেশ কম, ষাট দ্রাশমাস অর্থাৎ এক ডলার।

খবরটা জেনেও আমি ট্যাক্সি করেছি। কারণ একে তো নতুন দেশ, তার ওপর বিমানকম্প্যানির বাস আমাকে সোজা ওঁদের সিটি-টার্মিনালে নিয়ে যেত। সেখান থেকে ট্যাক্সি করেই হোটেলে পৌছতে হত। তাছাড়া শুনেছি তুলনায় এথেন্সে ট্যাক্সিভাড়া কম। আমার নাকি সাত / আট ডলারের মতো ভাড়া পড়বে। আর রোমে দিতে হয়েছিল বত্রিশ ডলার। ভাগ্যিস প্রদীপবাবুর অনুরোধে তাঁর জনৈক য়ুরোপপ্রবাসী আত্মীয় আমাকে আশাতীত সাহায্য করেছেন। নইলে সরকারি পাঁচ শ' বিশ ডলার সম্বল করে এই ভ্রমণ সম্ভব হত না।

কেবল বাস ও ট্যাক্সি নয়, শুনেছি এথেন্স শহরে ট্রলি-বাস ও সাবওয়ে অর্থাৎ মেট্রোরেল রয়েছে। আছে দুটি রেলস্টেশন। কিন্তু সেসব যথাসময়ে দেখা যাবে। আপাতত এথেন্স পৌছবার মধ্যে মনে মনে আরেকবার এই সুপ্রাচীন দেশটি সম্পর্কে কিছু কথা ভেবে নেওয়া যাক।

মানব-সভ্যতার বিশেষ করে পাশ্চাত্য-সভ্যতার সূতিকাগার এই গ্রীসদেশটি য়ুরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। এটি বলকান-দেশসমূহের দক্ষিণ-প্রান্তিক অন্তরীপ।

গ্রীস (Greece) দেশের লাতিন নাম, 'GRAECIA' ইতালীতে GRAIOI' নামে এক উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে এদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁদের নাম থেকেই 'Greece' নামটির উৎপত্তি।

গ্রীসের উত্তরে আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়া। পুবে তুরস্ক এবং ঈজিয়ান (Aegian) উপসাগর। দক্ষিণে ভূমধ্য-সাগর আর পশ্চিমে আইওনিয়ান এবং আদ্রিয়াতিক (Ionian & Adriatic) উপসাগর। মূল-ভূখণ্ডের তিনদিকেই অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপ গ্রীসদেশের অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে ক্রীট হল বৃহত্তম।

দেশের প্রাচীনতম ও বিশালতম মহানগরী এথেন্স। রাজধানী।

এথেন্স দক্ষিণ অন্তরীপের প্রায় প্রান্তে অবস্থিত।

গ্রীস য়ুরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-প্রান্তিক দেশ ও এশিয়া মহাদেশের সীমারেখা। আগেই বলেছি গ্রীসের পুবে তুরস্ক। তুরস্কের বৃহত্তর অংশ এশিয়া মহাদেশে। অর্থাৎ তুরস্ক য়ুরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশেরই রাষ্ট্র। অবশ্য বর্তমান তুরস্কের য়ুরোপীয় অংশও একসময় গ্রীস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের কথা থাক। এখন অন্যকথা ভাবা যাক।

গ্রীস এশিয়া মহাদেশের সীমারেখা অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের উপকণ্ঠে অবস্থিত। তাই গ্রীষ্মকালে এদেশে বেশ গরম। এখন জুলাই মাস। বিমান থেকে অবতরণের আগে ক্যাপ্টেন জানিয়েছেন, আজ এথেন্সের উত্তাপ ২৭° সেন্টিগ্রেড। তবে সেই সঙ্গে ভরসা দিয়েছেন, সাগরতীরে অবস্থিত বলে বিকেলের দিকে শীতলবায়ু বইতে শুরু করবে এবং রাতে বেশ আরাম লাগবে।

শুনেছি, গ্রীসের পাহাড়ী অঞ্চলের আবহাওয়া ভারী মনোরম আর গ্রীষ্ম ও শরতে সারাদেশেই বেশ ভাল বৃষ্টি হয়।···

ড্রাইভারের ডাকে আমার ভাবনা থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি একটা গাছঘেরা গাড়িবারান্দায় ট্যাক্সি থেমেছে। বাঁদিকে সুবিশাল সবুজ-ল'ন। ওপাশে টেনিস-কোর্ট আর এপাশে ছোট জলাশয়, ফোয়ারা। তার চারিতীর জুড়ে নানারঙের বাহারী ফুল, অসংখ্য ফুলের টব। আর ডানদিকে হোটেলের সিঁড়ি—আমার হোটেল। কাচের সদর দরজার ওপরে লেখা—HOTEL STANLEY.

দারোয়ান ট্যাক্সির দরজা খুলে সেলাম জানায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হোটেল থেকে একজন বেয়ারা বেরিয়ে আসে। ড্রাইভার স্যুটকেস বের করে তার হাতে দেয়। ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে তার সঙ্গে উঠে আসি ওপরে—রিসেপশান লাউঞ্জে।

কার্পেটে মোড়া বেশ বড় লাউঞ্জ। দুদিকে কাচের দেওয়ালের ধারে ছোট-বড় সোফা ও সেন্টার টেবল আর কিছু বাহারী গাছের টব, ও অর্কিড। একদিকে জুয়েলারী শপ, সেলুন এবং ককটেল

বার। আরেকদিকে রিসেপশান কাউণ্টার।

কাউণ্টারে আসি। রিসেপশানিস্ট আমাকে সহাস্যে স্বাগত জানান। বিমানবন্দর থেকে পাওয়া সেই কাগজটুকু তাঁর হাতে দিই। সামনে বসে থাকা মেয়েটির হাতে সেখানি দিতেই মেয়েটি কম্পিউ-টারে মনোনিবেশ করে। ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকেন সেদিকে।

একটু বাদে ইংরেজীতে বলে ওঠেন—আপনি ভাগ্যবান! বেশ ভাল ঘর পেয়ে গেলেন। থার্ড ফ্লোরে, রোড সাইড, সাউথ ওপেন।

মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমার পাসপোর্ট চেয়ে নিয়ে রেজিস্টার খোলেন। নাম-ধাম লিখে রেজিস্টার এগিয়ে দেন। আমি সই করি। তারপরে জিজ্ঞেস করি—বেড ও ব্রেকফাস্ট-এর জন্য দৈনিক আমাকে কত ইউ. এস. ডলার দিতে হবে?

ভদ্রলোক বুক-পকেট থেকে ক্যালকুলেটার বের করে হিসেব করেন। তারপরে বলেন – ট্যাক্স নিয়ে বত্রিশ ডলার।

আমাদের টাকায় হিসেব করলে অঙ্কটা রীতিমত বৃহৎ! কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণে এসে যে ডলারকে টাকা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। সে বিচারে শস্তাই বলতে হবে, অন্তত হোটেলটির তুলনায়। রোমে আমি এর চেয়ে অনেক ছোট হোটেলে দৈনিক পঁয়ষট্টি ডলার দিয়েছি। অবশ্যি সেটা ছিল ডাবল বেডরুম। এবং শেষ পর্যন্ত তা কাজেও লেগে গিয়েছে। কানাডার তরুণী মিস ডেনা ম্যাকডোনাল্ডকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। বেচারী রিসার্চ করতে রোমে এসে 'পার্স' হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল।*

বেয়ারাটির হাতে চাবি দিয়ে রিসেপশানিস্ট বলেন—রুম ৩০৫। সে আমার স্যুটকেস নিয়ে লিফটে ওঠে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

সত্যই ঘরখানি চমৎকার। দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত পুরু কার্পেট। একপাশে আধুনিক আরামদায়ক শয্যা আরেকপাশে লেখার টেব্‌ল ও বসবার চেয়ার! প্রকাণ্ড আয়না বসানো বেশ বড়

* লেখকের 'রমণীয়া রোম' বইখানি দ্রষ্টব্য।

একটা ওয়ারড্রোব, রঙীন টি. ভি. এবং ডায়াল টেলিফোন। সংলগ্ন সুদৃশ্য বাথরুমে বেসিন বাথটব ও শাওয়ার, গরম ও ঠাণ্ডাজলের অঢেল ব্যবস্থা আর টয়লেটে ঝক্‌ঝকে কমোড।

স্যুটকেস রেখে দিয়ে বেয়ারা বিদায় চায়। জিজ্ঞেস করি—রেস্তরাঁটি কোন তলায়?

—আজ্ঞে ফার্স্ট ফ্লোরে।

—এক কাপ চা পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়ই। বেয়ারা এগিয়ে যায় টেলিফোনের কাছে। ফোন তুলে চায়ের অর্ডার দেয়। তারপরে টেলিফোনের পাশে রাখা একখানি কার্ড দেখিয়ে বলে—এটা টেলিফোন ইন্‌ডেক্স। এতে এই হোটেলের বিভিন্ন দপ্তর ও এথেন্স শহরের সমস্ত প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে।

সেলাম করে দরজা ভেজিয়ে বেয়ারা চলে যায়। আমি প্যান্ট-সার্ট ছেড়ে পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে নিই। তারপরে ঘরের সামনে কাচে ঘেরা টেরাসে আসি। এখানেও দু'খানি চেয়ার ও একটা ছোট গোল-টেব্‌ল রয়েছে। আর এটাও এয়ারকণ্ডিশানড। রিসেপশানিস্ট বলেছেন, এই দশতলা হোটেলে চারশ' ঘর, তিনটি বার ও কাফি শপ, রেস্তরাঁ, ডাইনিং হল ও কনফারেন্স হল এবং কিছু দোকান-পাট রয়েছে। সবই এইরকম সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

তিনি ঠিকই বলেছেন, ঘরখানির চমৎকার অবস্থান—রোডসাইড সাউথ ওপেন। সামনে নিচের দিকে তাকালেই প্রশস্ত রাজপথ। নানা আকারের নানা রকমের গাড়ি অনবরত যাতায়াত করছে। ট্রলি বাসগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকারে আমাদের বড় একতলা বাসের মতো কিন্তু ট্রামের মতো ইলেক্ট্রিসিটিতে চলছে। লাইন নেই কেবল রাস্তার মাঝামাঝি মাথার ওপরে পাশাপাশি এক-জোড়া বৈদ্যুতিক তার, একটি যাবার একটি আসবার ওভারহেড লাইন। তারই সঙ্গে একটা 'ইলাসটিক' তার দিয়ে বাসগুলি যুক্ত। ফলে বাসগুলো সারা রাস্তায় এদিক-ওদিক যাতায়াত করতে পারছে।

ট্রামের মতো রাস্তা জ্যাম করছে না।

দরজার বেল বেজে ওঠে। ঘরে এসে দরজা খুলি। চা এসে গেছে। মেয়েটি আমাকে সেলাম করে ট্রে হাতে ভেতরে আসে। পট থেকে চা ঢেলে কাপটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে। আমি তাকে ধন্যবাদ দিই।

মেয়েটি পকেট থেকে ছোট একটি নোটবুক ও কলম বের করে সুরেলা স্বরে জিজ্ঞেস করে—স্যার, আপনি তো ভেজিটারিয়েন ?

আমি মাথা নাড়ি। সে বলে—আপনি ডিনারে কি নেবেন ?

এরই নাম ব্যবসা ! পাছে আমি বাইরে গিয়ে খেয়ে আসি। তাই বিকেলেই রাতের খাবারের অর্ডার নিয়ে নিচ্ছে। নিকগে, নতুন দেশ, নতুন শহর। কোথায় আবার খাবারের ধান্দায় ঘুরে বেড়াবো ? কিন্তু কি অর্ডার দেব বুঝতে পারছি না। বরিশালের বাঙাল এথেন্সে এসেছি। ইলিশের কাঙাল হয়েও প্রাণের দায়ে নিরামিষাশী হয়েছি। নইলে যে অপরিচিত মাছ-মাংস গলাধঃকরণ করতে হবে।

আমাকে নীরব দেখেই বোধকরি মেয়েটি বলে—আপনি বরং মিকসড ভেজিটেবল, এগফ্রাই, স্যালাড ও রাইস নিন।

—রাইস পাওয়া যাবে ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে তাই নেব।

মেয়েটি নোটবুকে লিখতে লিখতে জানায়—আমাদের ডিনার টাইম বিকেল সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারোটা। ডাইনিং হল ফার্স্ট ফ্লোরে !

আমি মাথা নাড়ি। মেয়েটি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে হাসিমুখে বিদায় নেয়।

আমি ভাবি অন্যকথা। বিদেশে এসে আমি নিরামিষাশী হয়ে যাই কিন্তু ডিম খেতে আপত্তি করি না। কারণ নির্ভয়ে ডিম খাওয়া যায় আর ডিম য়ুরোপে নিরামিষ খাদ্য রূপে বিবেচিত।

চা শেষ করে টেলিফোনের কাছে আসি। ইনডেক্স দেখে রিসেপশান ডায়াল করি। বলি—আমাকে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার পাঠিয়ে দিন। আরেকটা কথা…

—বলুন স্যার!

—আমি কি আজ রাতে কোন কণ্ডাক্টেড বাসট্যুর নিতে পারি?

—কেন পারবেন না! এখন সবে বিকেল ছ'টা, আটটায় বাস আসবে। 'CHAT' Tours No 2, Athens by night. Agency Office eparture 20.30 Hrs. Return O. 30. Hrs Price Drs. 1850 with Dinner and Floor show.'

একবার একটু থামেন লোকটি। তারপরে আবার বলেন—'CHAT' হচ্ছে গ্রীসের একটি শ্রেষ্ঠ ভ্রমণসংস্থা, ট্যুর কণ্ডাক্টরস। ভেরী রিলায়েবল এ্যাণ্ড পাঙচ্যুয়াল। তাঁরাই আমাদের কাজ করেন।

—আচ্ছা ১৮৫০ দ্রাশমাস মানে কত ইউ. এস. ডলার?

একটু চুপ করে থাকেন লোকটি, বোধকরি হিসেব করে নিচ্ছেন। আমিও নীরব থাকি। এবারে বলেন—৩০.৮৩ ডলার।

—কিন্তু আমি যে ভাই আপনাদের লোকের কাছে ডিনারের অর্ডার দিয়েছি?

—তাতে কি হয়েছে? আপনি যদি ট্যুর বুক করেন, তাহলে আপনার অর্ডার ক্যান্সেল করে দেব।

—আচ্ছা, আজকের ট্যুরে সিট আছে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিট পেয়ে যাবেন।

—তাহলে বুক করে দিন, আমার রুম নম্বর ৩০৫। আমি একটু বাদে এসে ভাড়াটা দিয়ে যাচ্ছি।

—তার কোন দরকার হবে না স্যার! ভাড়াটা আপনার বিলে যোগ করে দেব। আপনি আটটা নাগাদ লাউঞ্জে চলে আসুন!

তাই আসি। রিসেপশানিস্ট যুবকটির সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে সোফায় গিয়ে বসতে অনুরোধ করেন। বলেন—বাস এলে ওঁদের প্রতিনিধি এখানে এসে খবর দেবেন। তখন তাঁর সঙ্গে যাবেন।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে একখানি সোফায় এসে বসি। রোম থেকে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি, বিমানে লাঞ্চ করেছি। দুপুরের ফ্লাইট হলে সব পর্যটকই তাই করেন। কারণ ব্রেকফাস্ট করতে পয়সা লাগে না, ওটা হোটেল-ভাড়ার সঙ্গে। এবং ভরপেট খাবার পাওয়া যায়। বিমানের খাবারও বেশ ভাল।

তাহলেও আজ আমি লাঞ্চ্ করেছি দুপুর একটা নাগাদ আর এখন বিকেল আটটা। ট্যুর-কণ্ডাক্টর কখন ডিনার দেবেন কে জানে। সত্যি বলতে কি এখুনি একটু খিদে খিদে মনে হচ্ছে।

তা হোক্ গে। আজ ডিনারের জন্য ভাল দাম দিতে হবে। আবার গাঁটের কড়ি খরচ করে এখন কিছু খাবার প্রশ্ন ওঠে না। আর তার সময়ও নেই। আটটা বাজে। এখুনি বাস এসে যাবে।

তার চেয়ে বরং মানুষ দেখে খিদে ভুলে থাকার চেষ্টা করা যাক। বড় হোটেল। কত মানুষ আসা-যাওয়া করছেন। এঁদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাই বেশি। তারপরেই জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ। জাপান এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ আর মধ্যপ্রাচ্য তৈলসম্পদে সম্পদশালী। ওঁদের কারো ডলারের অভাব নেই। তাই ওঁরা নিয়মিত য়ুরোপ ভ্রমণে আসেন। কেনা-কাটাও প্রচুর করেন। এখানেও তাই দেখছি। মাঝে মাঝেই দু-চারজন করে জুয়েলারী শপে যাচ্ছেন। কেউ বা সেলুনে ঢুকছেন। এখন ছেলে-মেয়ে উভয়েরই সেলুন প্রয়োজন।

কিন্তু প্রয়োজন হলেই তো সেলুনে ঢোকা যায় না। তার জন্য ডলার চাই। আমারও তো চুলছাটা দরকার। প্রায় দু-মাস হল য়ুরোপে এসেছি। কিন্তু সেলুনে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিনে। কারণ এখানে চুলছাটা একটা রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমার বার্লিনবাসী বন্ধু গৌরাঙ্গ বসু রায় কলকাতায় গেলেই চুল ছেটে নেয়। তার মতে আমাদের দেশে চুলছাটা এতই শস্তা যে কেবল চুলছাটার জন্যই মাঝে মাঝে বার্লিন থেকে কলকাতা যাওয়া উচিত।*

* লেখকের 'বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া' বইখানি দ্রষ্টব্য।

লাউঞ্জের বড় ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠি। এযে দেখছি সাড়ে আটটা! তাড়াতাড়ি উঠে আসি রিসেপশানে। সেই ভদ্রলোক আমাকে দেখে যেন আঁতকে ওঠেন। বলেন—আপনি এখনো এখানে! বাসের লোক এসে তো চলে গেল।

হায় হরি! এখন উপায়?

তিনি নিজেই উপায় বাতলে দেন। একখানি লাল রঙের 'ব্রোশিওর' বা পুস্তিকা আমার হাতে দিয়ে বলেন—আপনি একটা ট্যাক্সি ধরে তাড়াতাড়ি এঁদের অফিসে চলে যান। আশা করি বাসটা পেয়ে যাবেন। আমিও ফোন করে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসি। অপেক্ষমাণ একখানি ট্যাক্সিতে উঠে বলি—'CHAT' tours office, 4 Stadiou Street. Quickly please.

ড্রাইভার মাথা নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দেন। আমি গাড়িতে গা এলিয়ে দিয়ে 'ব্রোশিওর'খানি দেখতে থাকি। সব মিলিয়ে তিরিশটি 'ট্যুরস' বা ভ্রমণের বিশদ বিবরণ রয়েছে। কোনটি বাসযোগে কোনটি বা জাহাজে। কোনটি এক বেলার কোনটি বা তেরোদিনের। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের সমস্ত দর্শনীয় স্থান ও তার বিভিন্ন দ্বীপ দর্শনে যাবার ব্যবস্থা তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে এঁরা জাহাজে করে বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশ দর্শন করিয়ে আনেন। নিয়ে যান তুরস্ক, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, ইজরাইল ও মিশর প্রভৃতি দেশে। কোন ভ্রমণের মূল্য ৯০০ দ্রাশমাস অর্থাৎ ১৫ ডলার আবার কোন ভ্রমণের জন্য দিতে হবে ২২৫০ ডলার।

একটা বড় ও দুটি ছোট রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি থেমে যায়। ড্রাইভার বলে—CHAT Tours Terminal.

তার মতো আমিও চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। না, কোথাও কোন ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে নেই।

—বোধকরি চলে গেছে। তবু চলুন, একবার ওঁদের অফিসে যাওয়া যাক। ড্রাইভার বলেন।

টার্মিনালে যখন বাস নেই, তখন অফিসে গিয়ে কোন লাভ হবে কি ? তাহলেও যাওয়া যাক একবার।

একটু এগিয়ে একটা ছোট রাস্তার ওপরে সুসজ্জিত অফিস। তেমন বড় নয় কিন্তু খুবই তৎপর। আমি ঘরে ঢুকতেই স্বয়ং ম্যানেজার আমাকে কাছে ডাকেন, বসতে অনুরোধ করেন। তার-পরে বলেন—আপনি মিস্তার দস্তিদার, ওতেল স্তানলি থেকে আসছেন ?

মাথা নেড়ে উওর দিই—হ্যাঁ।

—দেখুন, আমরা খুবই লজ্জিত। আমাদের প্রতিনিধি আপনাকে ডেকে আনেন নি। অন্যান্যদের নিয়েই চলে এসেছে। অবশ্য তারও খুব একটা দোষ নেই। একে তো সে আপনাকে চেনে না, তার ওপরে ওতেল থেকে তাকে বিশেষ করে আপনার কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। আগামীকাল থেকে আর এমন হবে না, প্রয়োজন হলে আপনার ঘরে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে।

—না, তার দরকার হবে না, আমি লাউঞ্জে অপেক্ষা করব।

—আমরা ওতেলে বলে দিয়েছি, আপনার এই ট্যাক্সি ভাড়াটা আমাদের একাউন্তে ডেবিত করতে।

—না, না, তার দরকার নেই।

—আছে বৈকি ! আপনার 'ট্রাবল্‌স' হল, আপনার সন্ধ্যেটা মাটি করে দিলাম।

—আপনারা তো ইচ্ছে করে করেন নি। আচ্ছা আসি।

ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে আসি অফিস থেকে। ফিরে আসি হোটেলে।

রিসেপশানিস্ট আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করেন। ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। তারপরে বলি—ডিনার পাওয়া যাবে তো ?

—নিশ্চয়ই।

—আমি কিন্তু রাইস চাই !

—তাই পাবেন। আপনি ডাইনিং হলে চলে যান। আমি বলে দিচ্ছি। ভদ্রলোক ফোনের রিসিভার হাতে নেন।

জিজ্ঞেস করি—ডিনারের পরে কি করা যায় বলুন তো?

একটু ভেবে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন—আপনি ডিনার সেরে আমাদের রুফগার্ডেন-কাম-সুইমিং পুল-এ চলে যান। সেখানে যেমন সব রকমের ড্রিঙ্কস পাবেন, তেমনি আলো ঝলমল রাতের এথেন্স দেখতে পারবেন! অপরূপ দৃশ্য, আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

তাই লাগে। রোমে আমার হোটেলেও রুফ-গার্ডেন ছিল। কিন্তু সেটি এমন সুন্দর ও সুবিন্যস্ত নয়। আর সেখানে সুইমিং পুল নেই। সেখান থেকে শহরের দৃশ্যও নয় এমন অপরূপ। এ ছাদটাও যে তার চেয়ে অনেক বড় এবং উঁচু!

নানা রঙের ছোট-বড় ফুল ফল ও পাতাবাহার গাছের টব দিয়ে সুসজ্জিত বাগান। কিছু কিছু গাছ বেশ বড় এমন কি অলিভ্ বা জলপাই গাছ পর্যন্ত রয়েছে। অবশ্য এটি 'ডোয়ার্ফ' মানে বামনগাছ।

জলপাই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। এ অঞ্চলের বিশেষ করে গ্রীসের জলপাই যেমন আকারে বড়, তেমনি সুস্বাদু। সম্মানিত বৃক্ষও বটে। জলপাই গ্রীসের জাতীয়ফল। তাই স্বাভাবিক ভাবে জলপাই এই রুফ-গার্ডেনে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

ফুল ও ফল গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেমন দোলনা ও ইজি-চেয়ার রয়েছে, তেমনি আছে লতা-পাতায় ঢাকা কয়েকটি কুঞ্জবন। বলা বাহুল্য সেগুলির কোনটাই জনহীন নয়, নির্জনে গুঞ্জনমুখর। কপোত-কপোতীর মতো পর্যটক-যুগল প্রেমালাপে মগ্ন। কেউবা চুম্বনরত।

এতদিন ধরে য়ুরোপ ভ্রমণ করছি। সুতরাং ব্যাপারটা গা-সহা হয়ে গেছে। কেবল আজও বুঝতে পারি না, যাঁরা হোটেলে একঘরে বাস করছেন, তাঁরা এই আচরণগুলো ঘরের চার-দেয়ালে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকাশ্যস্থানে প্রদর্শন করেন কেন?

আর বুঝতে পারি না ওঁদের পোশাকের এত স্বল্পতার কারণ। মানছি ওদের দেশের তুলনায় গ্রীস গরম দেশ। কিন্তু তাই বলে

মেয়েরা পর্যন্ত পথে-ঘাটে এমন অর্ধউলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবেন ? আর এটা তো রুফ-গার্ডেন। এখানে ওঁরা কি পোশাকে শুয়ে-বসে আছেন, তার বিবরণ না দেয়াই ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে সুইমিং পুলের সামনে আসি। আকারে খুব বড় না হলেও ভারী সুন্দর। নীল রঙের টাইল্‌স দিয়ে বাঁধানো কৃত্রিম সরোবর। সাঁতার কাটার বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। আর আছে চারিদিকে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা। তাই সন্ধ্যার পরেও জলাশয়টিকে নীল-যমুনা বলে মনে হচ্ছে। যমুনাই বটে, তীরে রাসলীলা আর জলে বস্ত্রহরণলীলা চলেছে।

জলাশয়ের তীরভূমি লাল টাইল্‌স দিয়ে বাঁধানো। সেখানে কয়েকটি বড় বড় রঙীন ছাতার তলায় বসবার ব্যবস্থা। সন্ধ্যার পরেও ছাতাগুলো কেন মেলে রাখা হয়েছে বুঝতে পারছি না। পাছে আকাশের চাঁদ ওঁদের রাসলীলার সাক্ষী হয়ে থাকে, এই ভয়ে কি ?

হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছই। এদিকটায় আলো কম। অথচ ছোট একখানি বেঞ্চি খালি পড়ে রয়েছে ! তাড়াতাড়ি বসে পড়ি।

বসে বসে রাতের আলোকোজ্জ্বল এথেন্সকে দেখি। শুধু পথ আর বাড়ির আলো নয়, সেই সঙ্গে চাঁদের আলোও রয়েছে। পূর্ণিমার নয় দ্বাদশী কিম্বা ত্রয়োদশীর চাঁদ। চাঁদের আলোয় দূরের পাহাড়ের আর অনতিদূরের সাগরকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আর দেখছি আলো ঝল্‌মল উর্বশী এথেন্স। 'এথেন্স বাই নাইট' ট্যুর না করতে পেরে বৃথাই মন খারাপ করেছি। বাসে বসে তো এই অপরূপা এথেন্সকে দেখা হত না আমার।

আলোর এথেন্স উত্তরের ধূসর পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে সমতলে। বিস্তীর্ণ সমতল ছাড়িয়ে এসেছে এগিয়ে, একেবারে আমার পাশে। তারপরে আবার আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। গিয়ে পৌঁচেছে সাদা সাগরের কাছে। স্থির পাহাড় থেকে অস্থির সাগর পর্যন্ত প্রসারিত এথেন্স। অচল পাহাড় থেকে সচল মহাসাগর

তার সীমারেখা।

না। উর্বশী এথেন্স সীমাহীনা। সে অসীম, সে অনন্ত, সে অক্ষয়। প্রায় চার হাজার বছর ধরে সে মানবসভ্যতার জয়গান গেয়ে চলেছে। তার বুকের ওপর কত রক্ত ঝরেছে। কত আগুন জ্বলেছে। কত ধ্বংসলীলা চলেছে। কিন্তু আবার সে গড়ে উঠেছে। আজও সে বিশ্বের একটি বৃহত্তম মহানগরী।

আর তাই আমি আজ এখানে। প্রাচীন ভারত থেকে প্রাচীন গ্রীসে। এসেছি মহানগরী এথেন্সকে আমার প্রাণের অভিনন্দন জানাতে। মহানগরী এথেন্স, তুমি এই অখ্যাত ভারত সন্তানের প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করো!

তিন

রিসেপশানিস্ট বলেছিলেন, আমি ভাগ্যবান। ভাল ঘর পেয়েছি, রোড সাইড, সাউথ ওপেন। কথাটাকে কাল সত্য বলে মেনে নিলেও আজ কিন্তু প্রহসন বলে মনে হচ্ছে। কারণ কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি এবং তা এই রোড সাইড এবং সাউথ ওপেন হবার জন্যই।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর সুতরাং দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণ শ্রবণের সুযোগ নেই। শুনেছি গাড়ির শব্দ। সারারাত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। আর সেই শব্দে বার বার আমার নিদ্রা গেছে টুটে। উর্বশী এথেন্সের প্রথম রাতটি তন্দ্রা ও জাগরণের মাঝে কেটেছে আমার।

রাতে ঘুম না হলেও আর শুয়ে থাকা উচিত হবে না। সাতটা বাজে, সাড়ে আটটায় বাস আসবে। তার আগেই দাড়ি কামিয়ে বাথরুম সেরে ব্রেক্-ফাস্ট করে লাউঞ্জে যাওয়া দরকার। ঘরবদল করার ব্যবস্থা করতে হবে। মাথায় থাক্ রোড সাইড আর সাউথ ওপেন।

আজ আমি 'এথেন্স সাইট সিয়িং ট্যুর' কবব। চার ঘণ্টার বাস ভ্রমণ! ভাড়া ৯২৫ দ্রাশমাস অর্থাৎ সাড়ে পনেরো মার্কিন ডলার।

তুলনায় এথেন্স শস্তা শহর। জুরিখ লণ্ডন পারি কিম্বা রোম শহরে এই ৩২ ডলার ভাড়ায় এরকম হোটেলে এত ভাল ঘর পাওয়া যেত না। কিন্তু তুলনায় এখানে খাবারের দাম বেশি। গতকাল ডিনারে ভাত ভেজিটেবল্স ওমলেট এবং সালাড নিয়েছিলাম, সাত ডলার লেগেছে। এই খাবার কিন্তু ঐসব শহরে পাঁচ ডলারে পাওয়া যেত। যে দেশ যত উন্নত, সেই দেশে খাবারের দাম তত কম আর মজুরি অর্থাৎ মানুষের দাম তত বেশি।

বাথরুম সেরে পোশাক পালটে কিটব্যাগ নিয়েই ডাইনিং হলে আসি। ব্রেক্ফাস্টের ব্যবস্থা দেখে খুশি হই। ফলের রস, মাখন ও জ্যাম দিয়ে টোস্ট্, আলুভাজা, ওমলেট ও চা পাওয়া গেল। ভরপেট খাবার। এবং এর জন্য কোন দাম দিতে হবে না কারণ এটা হোটেল। ভাড়ার মধ্যে। য়ুরোপের সর্বত্র হোটেল, হস্টেল ও পেনসন প্রভৃতিতে 'বেড এ্যাণ্ড ব্রেক্ফাস্ট সিস্টেম'।

অতএব গতরাতে ডিনারে বেশি খরচ হবার কথা ভুলে যেতে হয়। ব্রেক্ফাস্ট সেরে খুশি মন নিয়ে নিচে নেমে আসি। রিসেপশানিস্ট সুপ্রভাত জানিয়ে হাসিমুখে অনুরাধ করেন—দয়া করে ওখানে গিয়ে বসুন! আজ আর ভুল হবে না। তাছাড়া, ঐযে ওখানে যাঁরা বসে আছেন, ওঁরা সবাই আপনার সহযাত্রী।

—ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বেশ তো বলুন!

ওর হাতে ঘরের চাবিটি দিয়ে বলি—আমাকে ভাই ঘরটা পালটে দিতে হবে। আমি বাড়ির পেছন দিকের অর্থাৎ যেদিকে বড় রাস্তা নেই, সেদিকের একখানি ঘর চাই।

—কেন বলুন তো! সে ঘরগুলো তো এত ভাল হবে না! আলো-হাওয়া কম।

—না হোক। আমাকে তারই একখানি ঘর দিন। প্রয়োজন হলে আমি একই ভাড়া দেব।

—কিন্তু কেন?

বাধ্য হয়ে কারণটা খুলে বলতে হয়। শুনে ভদ্রলোক মৃদু হাসেন। বোধকরি মনে মনে আমার নির্বুদ্ধিতায় বিস্মিত হন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন না। শুধু সবিনয়ে বলেন—বেশ তো আপনি বাসভ্রমণ শেষ করে আসুন, আমরা আপনার ঘর পালটে দেব।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে লাউঞ্জে এসে বসি। আমার কাছে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ কিম্বা পীতাঙ্গ অর্থাৎ জাপানী। কেবল আমার ডানদিকে যে যুবক-যুবতী বসে আছেন, তাঁরা অন্য কোন দেশী হবেন। যুবকটির বয়স বোধকরি বছর তিরিশ আর যুবতীর বিশ / বাইশ। ছেলেটিকে কালোই বলা চলে কিন্তু মেয়েটি বেশ ফর্সা। দুজনেই লম্বা। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান আর মেয়েটি স্লিম্। ছেলেটির মাথাভর্তি ঝাক্ড়া চুল কিন্তু মেয়েটির বয়-কাট।

কেবল আমি নয়, ওরাও মনে হচ্ছে আমার প্রতি কিঞ্চিত কৌতূহলী। বিদেশে বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্য। কিন্তু ওরাও কি আমার দিকে তাকিয়ে আমার বিষয়ে কিছু বলাবলি করছে। আমি যে ওদের ভাষা বুঝতে পারছি না।

তাহলেও আলাপ করতে হবে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি। ওরাও দুজনে একটু হেসে উত্তর দেয়। তারপরেই ছেলেটি ইংরেজিতে বলে—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?

—নিশ্চয়ই। আমি সহাস্যে বলি।

—আপনি কি ইণ্ডিয়ান ?

মাথা নেড়ে বলি—আপনার অনুমান সত্য।

—ওর নয়। মেয়েটি বলে ওঠে। তারপরে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে সগর্বে বলে—ইট্ ইজ মী। আমি বলেছি, আপনি নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান। ও বলেছে, আপনি নাকি বাংলাদেশী।

আমি হেসে দিই। ওরা আমার দিকে তাকায়। বলি—তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছো।

—মানে ? মেয়েটির স্বরে অসন্তোষ। সে বোধকরি ছেলেটিকে তার কৃতিত্বের অংশীদার করে নিতে চাইছে না।

আমি ওকে বুঝিয়ে দিই—তুমি তো নিশ্চয়ই শুনেছো যে ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একই দেশ ছিল।…

সে মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—আমার যেখানে জন্ম অর্থাৎ যেখানে আমার পূর্বপুরুষদের বাড়ি-ঘর ছিল, সেটি এখন বাংলাদেশ। দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশ ছেড়ে সপরিবারে আমাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে ইণ্ডিয়ায়। তাই আমি বাংলাদেশে জন্মেও একজন ইণ্ডিয়ান।

ছেলেটি মৃদু হাসে। আর মেয়েটি সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে—জন্ম বাংলাদেশে হলেও তো আপনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, আপনি একজন ইণ্ডিয়ান।

—নিশ্চয়ই। আমাকে ওর দাবী মেনে নিতে হয়।

সে খুশি হয়। ছেলেটি আবার একটু হাসে।

এবারে জিজ্ঞেস করি—তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

—জেড্ডা থেকে।

—তোমরা কি আরবীয়?

—না। ছেলেটি বলে—আমি জেড্ডায় চাকরি করি। আমরা ইন্দোনেশিয়ান। আমার নাম চান্দ্রা ওসমান আর এ আমার স্ত্রী…

—সুপিনা। স্বামীর কথা কেড়ে স্ত্রী নিজের নাম জানায়। তারপরে আবার তেমনি নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে সগর্বে বলে ওঠে—আমি একজন রিয়েল ইন্দোনেশিয়ান।

—আর মিস্টার ওসমান?

—ওকে রিয়েল ইন্দোনেশিয়ান বলা উচিত হবে না।

—কারণ? সহাস্যে প্রশ্ন করি।

সুপিনা তেমনি গম্ভীর স্বরে বলতে থাকে—আমি ইন্দোনেশিয়ায় জন্মেছি, সেখানে স্কুল-কলেজে পড়েছি। আমার মা-বাবা ভাই-বোন সেখানেই থাকে। বিয়ের পরে মাত্র বছর তিনেক আগে আমি সে দেশ থেকে জেড্ডায় চলে এসেছি। আর ওর জন্ম সুইডেনে, সেখানেই ওর শৈশব কেটেছে। তারপরে ওরা মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী

হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য দেশে যায়, ব্যস এই পর্যন্ত।

—না। তুমি ঠিকই বলেছো। আমি সন্ধি করি—তুমি সত্যই একজন রিয়েল ইন্দোনেশিয়ান মেয়ে, চন্দ্রকে রিয়েল ইন্দোনেশিয়ান বলা যায় না।

—কিন্তু আপনি ওকে চন্দ্র বলছেন কেন, ওর নাম তো চান্দ্রা! স্বামীর নাম পরিবর্তনে আপত্তি জানায় সুপিনা।

একটু হেসে বলি—আমি ওকে চন্দ্র বলেই ডাকব কারণ আমাদের ভাষায় চন্দ্র মানে চাঁদ, খুবই আদরের নাম।

—তা আমায় তুমি আদর করে কি ডাকবে? সঙ্গে সঙ্গে আবদার করে মেয়ে।

বলি—সুপিন। আমাদের হিমালয়ে একটি ভারী সুন্দর পাহাড়ী নদীর নাম, সে তোমার মতই সদাহাস্যময়ী চিরচঞ্চলা।* তার নামের অর্থ সুপেয় জলধারা। আমাদের ভাষায় 'সু' মানে ভাল।

—আমাদের ভাষায়ও তো 'সু' মানে ভাল। চন্দ্র চেঁচিয়ে ওঠে।

আমি বলি—এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের দু দেশের মাঝে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যে হাজার হাজার বছরের। কিছু ভাষাগত মিল তো থাকতেই হবে।

—আপনাকে কি বলে ডাকব, এখনো জানান নি কিন্তু! চন্দ্র কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

উত্তর দিই—আমাকে তোমরা শঙ্কু বলে ডেকো। এটা আমার বাড়ির নাম।

—কিন্তু আপনার পদবী কি?

—ওটা প্রকাণ্ড বড়, ঘোষ দস্তিদার। বার বার বলতে অসুবিধে হবে তোমাদের।

—বেশ আমরা আপনাকে মিস্টার শঙ্কু বলেই ডাকব।

—আমরা নয়, আমি বলো।

* লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

—কেন ? চন্দ্র বিস্মিত।

আমিও তাই।

সুপিন আমার দিকে তাকায়। স্নিগ্ধ স্বরে বলে—আমি তোমাকে আঙ্কল বলব !

চমকে উঠি। কানাডার মেয়ে ডেনাও আমাকে আঙ্কল বলত। রোম বিমানবন্দরে বিদায় বেলায় সে আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়ে গেছে। আবার তেমনি মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। কদিন পরে তো এ মেয়েটার কাছ থেকেও নিতে হবে বিদায়, তখন যে ভারী দুঃখ পেতে হবে।···

—কি কথা বলছ না কেন ? আঙ্কল বললে তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি ?

—আপত্তি ! না, না, আপত্তি হবে কেন ? তাড়াতাড়ি জবাব দিই।

—তাহলে আজ থেকে তুমি আমার আঙ্কল···

—আমারও।···মাঝখান থেকে চন্দ্র বলে ওঠে।

—বেশ তবে তাই হোক।

ওরা খুশি হয়। কিন্তু সেকথা বলতে পারার আগেই একটি স্থানীয় যুবক লাউঞ্জে আসে। চিৎকার করে বলে ওঠে—

Passengers for CHAT Tours No I, Athens Sightseeing are requested to board the bus waiting on the Main Road.

ওদের সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়াই। চলতে চলতে চন্দ্র পকেট থেকে একখানি ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—আপনি এটা রেখে দিন আঙ্কল।

সুপিন হেসে দেয়। হাসবারই কথা। তার পাতানো সম্পর্কটা চন্দ্র স্বীকার করে নিল। তার মানে আঙ্কল বলে ডাকলেও আমি ওর কাকা নই, খুড়শ্বশুর, আঙ্কল-ইন্-ল'।

ওর কার্ডটায় চোখ বোলাই। লেখা রয়েছে—

H. CHANDRA OESMAN

Operations Manager,

Abbar & Zainy Sodexho Catering. Co.

ZEDDAR, P. O. Box No. 8078'

বাসে এসে উঠি। সুপিন সিট বাছাই করে। স্বামীকে সামনের সিটে বসিয়ে নিজে পেছনের সিটে বসে। তারপরে আমাকে বলে—আঙ্কল, তুমি আমার পাশে ব'সো।

প্রথমে একটু বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু তারপরেই ওর সহজ সরল হাসিমাখা মিষ্টি মুখখানির দিকে তাকাতেই আমার সব দ্বিধা ঘুচে যায়। আমি ওর পাশে বসে পড়ি। আর ভাবি—কি বিচিত্র অথচ কত মধুর মানুষের জীবন। অচেনা অজানা এই ভিনদেশী তরুণী আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে কেমন আপন করে নিলে! অথচ আজও আমরা মাঝে মাঝে জাতি ধর্ম আর বর্ণের প্রাচীর তুলে জগৎ-টাকে ছোট করে ফেলবার চেষ্টা করে চলেছি।

যাত্রীরা সবাই উঠে পড়েছেন। বাস চলতে শুরু করেছে। সুপিন জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা আঙ্কল, তুমি কি করো?

—মানে?

—মানে আমার স্বামী যেমন হেড-কুকের কাজ করে, তেমনি তুমি কি করো?

—তোমার স্বামী হেড কুক!

—নিশ্চয়ই। কেটারিং কম্পানীর অপারেশনস ম্যানেজার, হেড কুক ছাড়া আর কি ব'লো তো!

তা তো বটেই। অতএব আর কোন আপত্তি করি না। সে আবার জিজ্ঞেস করে—আঙ্কল, ব'লো না গো! তুমি কি করো?

—কি আর করি! ঘুরে বেড়াই।

—বেড়াবার ডলার কে দেয়?

—কয়েকটি প্রকাশক সংস্থা।

—কেন দেয়?

অতএব নাছোরবান্দা মেয়েকে লেখক পরিচয় দিতে হয়!

আনন্দে প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে সুপিন।

চন্দ্র পেছন ফিরে তাকায়। সুপিন বলে—তোমাকে আমি তখুনি বলেছি, আঙ্কল সাধারণ লোক নয়। জানো, আঙ্কল একজন অথার 'স্টাডি ট্যুর' করতে এসেছে। ফিরে গিয়ে 'ট্রাভেলগ' লিখবে।···

একবার একটু থামে সে। তারপরে আমার দিকে ফিরে আবার বলে—আচ্ছা, তুমি তো এই এথেন্স ভ্রমণ নিয়েও বই লিখবে ?

—ইচ্ছে তো রয়েছে।

—তাহলে আমাদের কথাও লিখবে ?

—নিশ্চয়ই।

—কি মজা ! শুনছো, আঙ্কল তার বইতে আমাদের দুজনের কথাও লিখবে।

—তাতে তোমার কি লাভ হবে ? মৃদু হেসে চন্দ্র জিজ্ঞেস করে। সে শান্ত ও স্বল্পবাক। সুপিনের মতো অকুণ্ঠিতা ও প্রগল্‌ভা নয়।

—অনেক লাভ হবে। উত্তর দেয় সুপিন। বলে—আঙ্কল তার বইতে আমাদের আমাদের কথা লিখবে আর আমার লাভ হবে না ! কিসব যা তা বলছ !

—তুমি যে সে বই পড়তেই পারবে না। আমরা তো আঙ্কলের ভাষা জানি না।

—আমরা না পড়তে পারলেও যাঁরা সে ভাষা জানেন, তাঁরা পড়বেন তো। তারা জানতে পারবেন এথেন্সে এসে লেখকের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার একটা দুষ্টু মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তাকে আঙ্কল বলে আপন করে নিয়েছিল।

চন্দ্র তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয় আর আনন্দে আমার চোখদুটি ভিজে ওঠে। ভাবি, আমি সত্যই সৌভাগ্যবান। নইলে এথেন্স এসে প্রথম দিনেই এমন সহজ সরল প্রাণময়ী মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হবে কেন ? ও নাই বা জানল আমার ভাষা। ও যে সেইসব ছেলে মেয়েদের একজন, যাদের দেখলেই ভালোবেসে ফেলতে হয়। জাতি ধর্ম বর্ণ আর ভাষা সেখানে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

কিন্তু কথাটা বলতে পারি না ওকে। তার আগেই বাস থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি কালকের সেই একটা বড় ও দুটি ছোট রাস্তার মোড়ে বাস থেমেছে। এবং আজ এখানে একখানি প্রকাণ্ড বাস রয়েছে দাঁড়িয়ে।

গতকালই শুনেছি এটা আমাদের ট্যুর-এজেন্সীর টার্মিনাল। এইরকম কয়েকখানি মিনিবাসে করে প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় এঁরা শহরের চারিদিক থেকে যাত্রী নিয়ে আসেন এখানে। যাত্রীরা ছোটবাস থেমে নেমে বড়-বাসের সওয়ার হন। শুরু হয় ট্যুর।

বাস বদলের পরে আমাদেরও যাত্রা হল শুরু। এবারেও স্তুপিন আমার পাশে বসেছে। কিন্তু চন্দ্রকে বসিয়েছে আমাদের পেছনের সিটে। কারণ জিজ্ঞেস করি। সে উত্তর দেয়—সামনে বসলে যে ও তোমার গল্প শুনতে পাবে না।

বুঝতে পারছি না ওর কথা। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি—আমাকে কি গল্প বলতে হবে নাকি!

—নিশ্চয়ই।

—কিসের গল্প?

—গ্রীক পুরাণের গল্প, হোমারের গল্প, সক্রেতিস প্লাতো আরিস্তোতল ও আলেকজান্দারের গল্প।

—কিন্তু এসব গল্প আমি জানি, একথা তোমাকে কে বলল?

—কেউ বলে নি। আমি জানি।

—কেমন করে?

—অথারদের এসব জানতেই হয়। যাক্ গে, আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করো না। বাস চলতে শুরু করেছে, এবারে তুমিও শুরু ক'রো।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে ওর সঙ্গে পরিচয় হলেও বেশ বুঝতে পারছি ওর আবদার রাখতেই হবে। অতএব শুরু করি—গ্রীক পুরাণে অনেক গল্প আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল পার্সিউস, হারকিউলিস এবং থেসিউস-এর কাহিনী।

—আমার কিন্তু হারকিউলিসকে সবচেয়ে ভাল লাগে। তুমি তাঁর কথা ব'লো।

—বলব। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে গ্রীকপুরাণের একটু পরিচয় দিয়ে নিতে চাই।

—বেশ, দাও।

বলতে থাকি—পৃথিবীর অন্যান্য সুপ্রাচীন জাতির মতো গ্রীকরাও প্রথমে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কল্পনা করেছেন যে এইসব দেব-দেবীরা কেবল মানুষের চেয়ে শক্তিশালী নন, তাঁরা মানুষের মতো মহৎ ও সুন্দর। মানুষের মতই তাঁদের হাসি-কান্না আনন্দ ও বেদনা আছে। আছে কামনা বাসনা ও প্রতিহিংসা। আর আছে মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসা। এক কথায় গ্রীক-পুরাণ দেব-দেবীদের মানুষের মতই সংসারসীমার মাঝে সমাসীন করেছে। অর্থাৎ দেবতাকে মানুষ রূপে গড়ে তুলেছে।

এখানেই গ্রীকপুরাণের বৈশিষ্ট্য। গ্রীকপুরাণ যেমন দেবতাকে বড় করেছে, তেমনি মানুষকেও ছোট করে নি। গ্রীকপুরাণের হিমালয় হল অলিম্পাস পর্বত। অলিম্পাসের অধীশ্বর হলেন দেবরাজ জুপিটার বা জিউস। দেবদুর্লভ তাঁর চরিত্রমহিমা। কিন্তু তিনি কয়েকজন মর্ত-মানবীর রূপ ও যৌবনের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেন নি। তাঁদেরই একজন হলেন হারকিউলিসের মা আল্কমিনা। দেবরাজের ঔরসে জন্ম হল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান মানবের। অর্থাৎ গ্রীকপুরাণ দেবতার সঙ্গে মানুষেরও যশোগাঁথা কীর্তন করেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি রোম গ্রীস জয় করে অর্থাৎ গ্রীস রোমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। কিন্তু রোমের সেই জয় ছিল একান্তই রাজনৈতিক। গায়ের জোরে রোম গ্রীসকে জয় করেছিল আর গ্রীস রোমকে জয় করেছিল হৃদয় দিয়ে। গ্রীসের সংস্কৃতি সেই যে রোমান সাম্রাজ্যকে গ্রাস করেছিল, আজও রোমের পথে পথে আর ইতালীর নগরে নগরে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি গ্রীকপুরাণের দেবালয় হল পবিত্র অলিম্পাস পর্বত। সেখানে দেব-দেবীদের সুবিশাল সব প্রাসাদ। আর দেবরাজ জুপিটার সেই স্বর্গসাম্রাজ্যের সম্রাট। ক্রোনাস হলেন তাঁর পিতা। কথিত আছে অনিবার্য কারণে তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন।...

—সেকি! সুপিন প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

থামতে হয় আমাকে। একটু হেসে বলি—এসব হচ্ছে পুরাণের গল্প। এসব কথা শুনে অত বিচলিত হয়ে পড়লে তো আর গল্প শোনা হবে না।

একটু লজ্জা পায় সুপিন। বলে—আই অ্যাম্ সরি আঙ্কল! তুমি ব'লো।

বলতে থাকি—পিতৃহন্তা হলেও জুপিটার ক্রোনাসের অন্যান্য সন্তানদের অর্থাৎ ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলে-মিশে ত্রিভুবনে দেববংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বর্গরাজ্য নিজের হাতে রেখে তিনি মেজভাই নেপচুন বা পেজি-ডনকে দিলেন সাগর-সাম্রাজ্য আর ছোটভাই প্লুটো বা হেডিসকে মৃত্যুরাজ্য বা পাতালপুরীর রাজা করে দিলেন।

দেবরাজ জুপিটারের রানী হলেন জুনো বা হেরা। দেবরাজ-সভায় তিনি স্বামীর পাশে সোনার সিংহাসনে উপবেশন করেন, রাজপুরীতে সোনার পালঙ্কে শয়ন করেন। তাঁর যেমন রূপ, তেমনি অহঙ্কার। বড়ই ঈর্ষাপরায়ণা।

ঈর্ষা অবশ্য অকারণে নয়। একে তো জুপিটারের অনেক উপপত্নী, তার ওপরে আবার তাঁদের অনেকেই মানবী। আর এই কারণেই তিনি বীর হারকিউলিসের জীবনকে দুঃখময় করে তুলেছিলেন।...

কিন্তু হারকিউলিসের কথা পরে হবে, এখন অন্যান্য দেবতাদের কথা বলে নিই। দেবরানী জুনোর দুই ছেলে 'মার্স' বা অরেস ও 'ভালকান' বা হেফিস্তোস আর একমেয়ে 'হিবি'। মার্স হচ্ছেন রণদেবতা আর ভালকান বিশ্বকর্মা।

মার্স তাঁর পিতা-মাতা কিম্বা অন্য দেব-দেবীদের মতই সুন্দর। কিন্তু ভালকান বড় কুৎসিত। এত কুৎসিত যে জন্মের পরেই জুনো তাঁকে অলিম্পাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পা দুখানা ভেঙে যায়। অথচ জুনো এই ছেলের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত প্রেমেরদেবী পরমাসুন্দরী ভেনাসের বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভেনাসের কথায় পরে আসছি। তার আগে অন্যকথা শুনে নাও।

জুপিটারের আরেক রাণী হলেন দেবী ল্যাটোনা অথবা লেটো। তাঁর গর্ভে দেবরাজের দুই দেবসন্তানের জন্ম—সূর্যদেব, অ্যাপেলো আর চন্দ্রদেবী ডায়না বা আর্তেমিস। গ্রীক-যৌবনের মূর্ত প্রতীক, অ্যাপোলো। তিনি পরম রূপবান গুণবান-বীর্যবান। প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের ধারক তিনি। পার্নেসাস পর্বতের পাদদেশে ডেলফি মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান। এটি গ্রীসের একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির রূপে সমাদৃত। বলা হয় অ্যাপোলোদেব এই মন্দিরে বসে স্বর্গ ও মর্ত্যের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

অ্যাপোলোর বোন হলেন ডায়না। তিনি অশেষ গুণবতী ও পরমাসুন্দরী। কিন্তু চিরকুমারী। তিনি কৌমার্যের দেবী আর চাঁদের অধিশ্বরী। চাঁদের আলো আর বনের হরিণ তাঁর বড় প্রিয়। কুমারীরা তাঁর পুজো করে বর লাভ করেন।

গ্রীকপুরাণের সবচেয়ে বিতর্কিতা দেবী হলেন ভেনাস বা আফ্রো-দিতি। তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী, তিনি অনন্ত যৌবনা। একই সঙ্গে স্বর্গের দেবতা আর মর্ত্যের মানুষকে আকর্ষণ করেন তিনি। কেউ সে আকর্ষণ এড়াতে পারেন না।

প্রেমের দেবী ভেনাস আর তাঁর সে প্রেম বাধা বন্ধনহীন। তাঁর প্রেম শাসন মানে না। কারণ জুপিটারের পুত্র কুৎসিত ভালকান হলেন তাঁর স্বামী। তিনি তাঁর প্রেমে তৃপ্ত নন। আর তাই তিনি রূপবান দেবতা ও মানুষদের আকর্ষণ করেন। রণদেবতা মার্স তাঁর দেবর, সমুদ্রদেব নেপচুন তাঁর শ্বশুর কিন্তু তাঁরা ভেনাসের জন্য পাগল। ফলে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

গ্রীকপুরাণে যুদ্ধের দেবী হলেন এথেনা বা মিনার্ভা। তিনিও দেবরাজ জুপিটারের কন্যা কিন্তু অযোনিসম্ভূতা। কথিত আছে একদিন জুপিটার প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় আকুল হয়ে পুত্র ভালকানকে একটা কিছু উপায় করতে বললেন। ভালকান তখন একখানি কুড়াল দিয়ে বাবার মাথায় খানিকটা অংশ কেটে ফেলতেই সেখান থেকে যোদ্ধা বেশে পূর্ণযৌবনা এথেনাদেবী বেরিয়ে এলেন।

দেবী মিনার্ভা কেবল যুদ্ধের দেবী নন, তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। যিনি আত্মরক্ষা কিম্বা দেশরক্ষা করেন, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করেন, তিনি কেবল তাঁদেরই যুদ্ধের জয়মাল্য প্রদান করেন।

—আঙ্কল, তুমি কিন্তু নেপচুন আর প্লুটোর কথা বললে না!

সুপিনের কথায় থামতে হয় আমাকে। একটু হেসে বলি—বেশ শোনো! তবে খুবই সংক্ষেপে বলছি।

—বেশ তো তাই ব'লো।

—আগেই বলেছি নেপচুন ও প্লুটো দেবরাজ জুপিটারের ভাই। নেপচুন সাগরের দেবতা। সাগরতলে তাঁর সুবিরাট প্রাসাদ। সাত সাগরের রাজা হয়েও তিনি দেবরাজ জুপিটারকে হিংসা করেন। ভাইপোর স্ত্রী ভেনাসের প্রতি তাঁর আসক্তির কথা সবাই জানেন।

জুপিটারের ছোট ভাই প্লুটো হচ্ছেন পাতালের রাজা। প্রকৃতি-রাণী ডিমিটারের মেয়ে সুন্দরী প্রসোপিনা তাঁর রাণী। তাঁরা পাতাল-পুরীতে বসবাস করেন।

আমি থামতেই সুপিন বলে ওঠে—হয়ে গেল!

হেসে উত্তর দিই—না। হয়ে যাবে কি? গ্রীকপুরাণে যে অসংখ্য দেবদেবীর কথা রয়েছে। অজস্র তাঁদের কাহিনী। সবার কথা জানাও নেই আমার। তাহলেও আমি আরেকজন দেবতার কথা বলব তোমাকে।

মাথা নেড়ে ঠিক হয়ে বসে সুপিন। আমি বলি—তাঁর নাম মার্কারি। তিনিও দেবরাজ জুপিটারের পুত্র। দেবরাজের আরেক রানী মায়াদেবীর ছেলে মার্কারি। তিনি চিরতরুণ ও পরমসুন্দর।

তাঁর জুতোজোড়া ডানার কাজ করে। সে জোড়া পায়ে দিয়ে তিন ভুবনে উড়ে বেড়ানো যায়। মার্কারি পিতৃভক্ত। তিনি দেবরাজের বিশ্বস্ত দূত। পিতার আদেশে রাজকার্য করতে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে অবিরত ভ্রমণ করেন আর প্রয়োজনে মানুষকে সাহায্য করেন। তাই তিনি তাঁর মানুষ ভাই পার্সিউসকে দুর্ভেদ্য তরবারি ও যাদুর পাদুকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নইলে বোধকরি পার্সিউসের পক্ষে মেডুসার দেশে যাওয়া ও তাকে বধ করা সম্ভব হত না।

চার

বাস থেমে যায়। থামতে হয় আমাকে। তাকিয়ে দেখি একটা বেশ বড় বাড়ির সামনে বাস থেমেছে। মাইক হাতে নিয়ে গাইড উঠে দাঁড়ান। ঘোষণা করেন—আর্কোলজিক্যাল মিউজিয়াম, ৪৪, পাতিসন স্ট্রীট, এথেন্স। লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্ট্‌লমেন, এই যাদুঘরটি দেখে আমরা আজ আমাদের এথেন্স দর্শন শুরু করব। ভেতরে যাবার জন্য মাথাপিছু একশ' দ্রাশমাস করে লাগবে। আপনারা দ্রাশমাসগুলো আমাকে দিন, আমি টিকেট করে নিয়ে আসছি।

১০০ দ্রাশমাস মানে ১.৬৬ ডলার। আমাদের দেশের বিচারে প্রবেশমূল্য হিসেবে বেশ বেশি। কিন্তু য়ুরোপের বিচারে খুবই সামান্য। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে একখানি নোট গাইডের দিকে এগিয়ে ধরি।

মিনিট দশেক বাদে গাইড ফিরে এসে আমাদের বাস থেকে নেমে আসতে বলেন। আমরা তাকে অনুসরণ করি হাঁটতে হাঁটতে গাইড বলতে থাকেন—এটি আমাদের জাতীয় সংগ্রহশালা। অবশ্য আমাদের ঐতিহ্যময় অতীতের তুলনায় মোটেই সম্পদশালী নয়। কারণ বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণে এদেশের বেশির ভাগ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন

ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারপরে যা ছিল, তারও অধিকাংশ তুর্কী আমলে বিদেশীরা বিশেষ করে বৃটিশরা নিয়ে গিয়েছেন। তাই এখানকার চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান সঞ্চয় রয়েছে বৃটিশ মিউজিয়ামে।

গাইড আবার বলেন—আজ এখানে আমি মাত্র আধঘণ্টা সময় দেব। কাজেই আপনাদের ভাল করে দেখা সম্ভব হবে না। আপনারা যারা গ্রীসের পুরাকীর্তির কথা ভাল করে জানতে চান, তাঁরা অবশ্যই আরেকদিন সময় হাতে নিয়ে এখানে আসবেন।

—এই মিউজিয়াম কি সপ্তাহে সাতদিনই খোলা থাকে। গাইড থামতেই সুপিন জিজ্ঞেস করে।

গাইড উত্তর দেন—না। সপ্তাহে পাঁচদিন অর্থাৎ মঙ্গল থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর রবিবার সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা। সোমবার বন্ধ থাকে।

আমরা গাইডের সঙ্গে ভেতরে আসি। সত্যই বেশ বড় সংগ্রহশালা। আধঘণ্টায় এর কি দেখব? তাছাড়া গাইড প্রকৃতপক্ষে দৌড়তে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে তাল রাখা রীতিমত কষ্টকর।

ছুটতে ছুটতে গাইড এসে দাঁড়ান অপরূপ কারুকার্য খচিত একটি সোনার মুখোসের সামনে। মুখে বলেন—গোল্ডেন মাস্ক অব আগামেমনন (Agamemnon)। এটি শুধু মহামূল্যবান নয়, সুপ্রাচীন গ্রীক সভ্যতার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আমরা দেখি। সত্যই দেখবার মতো। দেখে মনে হচ্ছে না এত পুরনো! একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে, যেন সবে তৈরি করা শেষ হল।

কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে পারি না। গাইড আবার ছুটতে শুরু করেছেন। বাধ্য হয়ে তাকে অনুসরণ করতে হল।

নানা আকারের পাথর ও ব্রোঞ্জের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। শুধু নর-নারী কিম্বা দেব-দেবী নয়, গরু ঘোড়া ও অন্যান্য পশু এবং পাখিদের মূর্তিও রয়েছে। কিন্তু কোনটাই অক্ষত নয়। তবু উন্নত

শিল্পমানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। অথচ এর অধিকাংশই সুপ্রাচীন, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মূর্তিও রয়েছে।

একটা হলে এসে আবার থামলেন গাইড। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দুটি মূর্তি দেখিয়ে গাইড বলেন—'চাইল্ড জকি' এবং 'থাণ্ডারিং জিউস'।

আমরা দেখি। সত্যই সুন্দর। যেন মূর্তি নয়, প্রাণময় মানুষ ঘোড়া আর দেবতা।

কিন্তু কেবল এদুটি মূর্তির কথাই বা বলি কেন, অন্যান্য মূর্তিগুলি ও যে তাই। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

অথচ তাকাবার অবকাশ কোথায়? গাইড আবার ছুটতে শুরু করেছেন। আমাদেরও ছুটতে হয়।

এবারে গাইড এসে থামলেন বেশ কয়েকখানি ফ্রেস্‌কো দিয়ে সাজানো একটি ঘরে। বললেন—এগুলি মাত্র কয়েক বছর আগে আনা হয়েছে।

—কোথা থেকে? জনৈক শ্বেতাঙ্গ পর্যটক প্রশ্ন করেন।

—এগুলি হল ফ্রেস্‌কোজ ফ্রম্‌ দা আয়ল্যাণ্ড অব সান্তোরিনি (Santorini)।

আমরা দেখি, দুচোখ ভরে দেখি। এখানেও একই ব্যাপার। সবই সুপ্রাচীন চিত্রসম্ভার। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, শিল্পী সবে শেষ করেছেন। সত্যই ক্লাসিক।

কিন্তু হলে কি হবে? গাইডের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয় মিউজিয়াম থেকে। আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হই। গাইড তাঁর কথা রেখেছেন। ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের ফিরিয়ে এনেছেন বাসের সামনে।

বাস চলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাকে আর কথা শুরু করতে হয় না। শ্রীমতী সুপিন সাময়িক ছাড় দিয়েছে আমাকে। কারণ গাইড মাইক হাতে নিয়ে নিজেই বলতে শুরু করেছেন—লেডিস এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, এখন আমরা এথেন্স মহানগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, গ্রীক সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন, অ্যাক্রোপলিস (Acropolis)

দেখতে চলেছি।···

একটু থামেন গাইড। আমরা সোজা হয়ে বসি। গাইড আবার বলতে থাকেন—Acropolis মানে নগরীর উচ্চতম স্থান। প্রাচীন গ্রীস যখন বহু নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, তখন সেসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির একটি করে অ্যাক্রোপলিস ছিল। সাধারণত নগরীর মাঝে কিম্বা উপকণ্ঠে অবস্থিত কোন উঁচু পাহাড়ের ওপরে এটি নির্মাণ করা হত। নির্মাণ কার্য আরম্ভ করে প্রথমে চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে নেওয়া হত। তারপরে তৈরি হত মন্দির, প্রাসাদ ও বাড়ি-ঘর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিম্বা যুদ্ধের সময় কিছু নাগরিক অন্তত যাতে নিরাপদ আশ্রয় পান, তার সব রকম ব্যবস্থা থাকত সেখানে।

বলা বাহুল্য এথেন্সের এই অ্যাক্রোপলিসই ছিল গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন অবস্থান তেমনি তার নির্মাণ শৈলী। আকারের দিক থেকেও সুবিশাল। মহাকালের করালগ্রাসে অন্যসব অ্যাক্রোপলিস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু এথেন্সের এই বিধ্বস্ত অ্যাক্রোপলিসটি আজ গ্রীক সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিদর্শন রূপে রয়েছে বেঁচে। এখন অ্যাক্রোপলিস বলতে আমরা কেবল এটিকেই বুঝে থাকি।

—আচ্ছা, কোন্ সময়ে এই অ্যাক্রোপলিসটির প্রথম নির্মাণকার্য শুরু হয়? মাঝখান থেকে জনৈক জাপানী পর্যটক জিজ্ঞেস করেন।

গাইড উত্তর দেন—সঠিক সময় নির্দেশ করা কঠিন। তবে বোধ-করি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের (end of the 2nd Millennium B. C) শেষদিকে তো বটেই।···

—তার মানে কতবছর বয়স হল আঙ্কল!

সুপিনের প্রশ্নে আমাকে তার দিকে ফিরতে হয়। আমি বলি—তা তিন হাজার বছরের ওপরে বৈকি!

—তি···ন হাজার! বাব্বা?

আমি মাথা নেড়ে গাইড়ের দিকে মনযোগ দিই। তিনি বলে চলেছেন—আপনারা সেখানে গিয়ে চারিদিকে যে সুরক্ষা প্রাচীর

দেখতে পাবেন, সেটি নির্মিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে। মনে হয় তখন এটা ছিল শহরে উত্তরসীমা এবং এখানেই প্রথম এথেন্সের ইষ্টদেবী এথেনার মন্দির নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এখানে যেমন একটার পর একটা মন্দির নির্মিত হতে থাকে, তেমনি গড়ে ওঠে বড় বড় বাড়ি। এবং অবশেষে এটি একটি সুরক্ষিত দুর্গনগরীতে পরিণত হয়।

মহাকবি হোমার তাঁর রচনায় দু'বার অ্যাক্রোপলিসের উল্লেখ করেছেন। আপনারা সবাই জানেন হোমার হলেন খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের গ্রীক মহাকবি।

আমরা মাথা নাড়ি। গাইড বলতে থাকেন—তবে মহাকবি হোমার তাঁর বিবরণে শুধু মন্দিরের কথাই উল্লেখ করেছেন। একবার বলেছেন, 'Wealthy temple' আরেকবার বলেছেন, 'Revered house of Erechtheus.' এরেখথিউস জনৈক গ্রীক লৌকিক-দেবতা। জনপ্রিয়তার বিচারে তাঁর স্থান ছিল দেবী এথেনার পরেই।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকেই গ্রীসদেশে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ শুরু হয়। আর তা প্রথম নির্মিত হয় এখানে। অনতিকাল পরে এখানেই মহানগরী এথেন্সের প্রথম প্রাসাদ তৈরি হয়। শুধু তাই নয় শ্বেত-পাথরের মূর্তিও প্রথম নির্মিত হয় এখানে। সেটি সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কথা।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে অ্যাক্রোপলিসে দেবী এথেনার পুরনো মন্দিরটি ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন মন্দির তৈরি করা হয়। কিন্তু সে মন্দিরও খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে ম্যারাথনের যুদ্ধ জয়ের পরে এথেন্সবাসীরা আগের মন্দিরটির পাশে এথেনাদেবীর আরেকটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেই থেকে এথেনা যুদ্ধেরদেবী রূপে পূজিতা হতে শুরু করেন।

মনে হয় ঐ সময় রাজদরবার থেকে ওখানে দেবী এথেনার আরও বড় একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সে পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে

থার্মোপলি যুদ্ধের পরে পারস্যবাহিনী কয়েকদিনের জন্য অ্যাক্রোপলিস সহ এথেন্স অধিকার করে নেয়। তারই মধ্যে তারা অ্যাক্রোপলিসের প্রায় সব মন্দির বিধ্বস্ত করে ফেলে।

অথচ ইতিমধ্যেই জলযুদ্ধে পারস্য নৌবাহিনী গ্রীসের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত। বিজয়ী গ্রীকবাহিনী ফিরে এসে দেখেন এথেন্স প্রায় শ্মশান হয়ে গেছে। এবং অ্যাক্রোপলিসকেই সবচেয়ে বড় আঘাত সইতে হয়েছে। তাহলেও অ্যাক্রোপলিস ত্বু বছর সেই ধ্বংসস্তূপ রূপেই পড়ে রইল। কারণ এথেন্সবাসীরা আগে তাঁদের বাড়ি-ঘর খানিকটা ঠিকঠাক করে নিলেন। ত্বু বছর বাদে তাঁরা অ্যাক্রোপলিসের দিকে মনযোগী হলেন।

প্রথমেই অ্যাক্রোপলিসের প্রাচীরকে আরও উঁচু এবং মজবুত করা হল। তাঁরা অ্যাক্রোপলিসকে যতখানি সম্ভব ত্বর্ভেদ্য করে তুললেন। তারপরে শুরু হল প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন। তাঁরা এখানে দেবী এথেনার স্নুবিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপন করলেন।

কয়েকটি নতুন অট্টালিকাও নির্মিত হল। আরও নানাভাবে অ্যাক্রোপলিসকে রমণীয় করে তোলা হয়। ফলে অনতিকাল পরেই অ্যাক্রোপলিস বিশ্বের বিস্ময় রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

—এক্সকিউজ মি মিস্টার! তখনকার সময়টা?

না, এ মেয়েটা দেখছি সময় সম্পর্কে বড়ই সচেতন। এবারে স্নুপিন সোজাস্নুজি গাইডকে জিজ্ঞেস করেছে।

গাইড তার দিকে ফিরে হাসিমুখে উত্তর দেন—সেটা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কথা ম্যাডাম!

—ধন্যবাদ।

গাইড আবার শুরু করেন—তারপরে রোমান যুগ। সে যুগে সমগ্র গ্রীস রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু রোমান সম্রাটগণ পারস্য সম্রাটদের মতো নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁরা এথেন্স কিম্বা অ্যাক্রোপলিসের ওপর কোন আঘাত হানেন নি। তাঁরা গ্রীসের স্নুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ফলে বাহুবলে রোম গ্রীসকে অধিকার করে নিলেও, গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি রোমকে জয় করে নিয়েছিল। এবং সে সাংস্কৃতিক বিজয় চিরস্থায়ী হয়েছে।

রোমান সম্রাটগণ মাঝে মাঝেই অ্যাক্রোপলিসের সংস্কারসাধন করেছেন। রোমসম্রাট ক্লডিয়াস (Claudius) প্রপিলেয়া (Propylaia) মন্দিরে একসারি চমৎকার সিঁড়ি তৈরি করে দেন। সম্রাট হাড্রিয়ান (Hadrian) আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পার্থেনন (Parthe-non) মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন, সুবিরাট ওলিম্পিয়ান জিউস (Olympian Zeus) মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ করেন। এই মন্দিরটি ছ'শ' বছর ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। হাড্রিয়ান এথেন্স নগরেও কয়েকটি বড়-বড় বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন। কৃতজ্ঞ গ্রীসবাসীরা তাই অ্যাক্রোপলিসে সম্রাট হাড্রিয়ানের একটি মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

তারপরে ২৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এলো গ্রীসের ওপরে এক অপ্রত্যাশিত আঘাত। রোমে শুরু হল গৃহযুদ্ধ। বিদ্রোহীরা এথেন্স আক্রমণ করে অকারণে নির্দয়ের মতো ধ্বংসলীলা চালালো। অবশ্য অনেকের মতে অ্যাক্রোপলিস সেই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় নি। কারণ রোমান বিদ্রোহীরা নগরীর নিচের দিকটাই বেশি ধ্বংস করেছিল। অ্যাক্রোপলিস নগরীর উচ্চতম অংশে অবস্থিত।

সেই তাণ্ডবের পরে কয়েক দশক ধরে এথেন্স একটি ছোট শহর রূপে বেঁচে রইল কোনমতে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে আবার শহরের সংস্কারকার্য শুরু হয়। এর একটি কারণ এত তাণ্ডব সত্ত্বেও এথেন্স তখন দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাপীঠ রূপে সারা য়ুরোপে আবার বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাই দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীরা দর্শনের পাঠ নিতে তখন এথেন্সে আসতে শুরু করেছেন।···

—সেটা বোধহয় সুমহান দার্শনিক সক্রেতিসের যুগ? সুপিন প্রশ্ন করে।

মৃদু হেসে গাইড উত্তর দেন—না, ম্যাডাম! সক্রেতিস জন্মেছিলেন তার প্রায় ন'শ বছর আগে। তাঁর জীবনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৯ থেকে ৩৯৯ অব্দ।

উত্তর শুনে সুপিন একটু লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি আমার দিকে ফিরে একটু হাসে।

একটু থেমে গাইড আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসেন। বলতে থাকেন—এই সময় মানে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় থিয়ডোসিয়াস-এর (Theodosius) এথেনীয় রানী বাইজেন্তিয়াম (Byzantium) রাজ্যের সিংহাসন পেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাণী তাঁর জন্মস্থান এথেন্স নগরীর উন্নয়ণে মনযোগী হলেন। তিনি এথেন্স শহরে এবং অ্যাক্রোপলিসে কয়েকটি বড় বড় বাড়ি তৈরি করালেন। কয়েকবছর আগে অ্যাক্রোপলিসের দক্ষিণাংশে তাঁর নির্মিত দুটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু ষষ্ঠ শতকে আবার নতুন ভাবে এথেন্সের ওপরে আঘাত আসে। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষ অকারণে দর্শনের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে দার্শনিকগণ শহর ছেড়ে চলে গেলেন। ফলে এথেন্স পুনরায় একটি আঞ্চলিক শহরে পরিণত হল।

এর পরে এথেন্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিবর্তন ঘটায় খ্রীষ্টধর্ম। রোমের যাজকগণ গ্রীসদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে আসেন। এবং এথেন্সবাসীরা সানন্দে তাঁদের স্বাগত জানালেন। অ্যাক্রোপলিসের বৃহত্তম মন্দির পর্থেনন একটি গীর্জায় (Church of Aghia Sophia—Devine Wisdom) পরিণত হয়। অনেকের ধারণা অ্যাক্রোপলিসের এরেখথিয়ন (Erechtheion) মন্দিরটিও একটি গীর্জায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

এইভাবে কয়েক শ' বছর অতিবাহিত হবার পরে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট দ্বিতীয় বেসিল (Basil-II) বুলগেরিয়া জয় করে রোমে ফিরে যাবার পথে এথেন্সে আসেন। তিনি পার্থেনন দর্শন করতে এসে মন্দিরটির দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার

সাধনের ব্যবস্থা করেন।

এর পরে একেবারে ত্রয়োদশ শতকের কথায় আসছি। ১২০৫ সালে তৎকালীন ডিউক অ্যাক্রোপলিসে একটি নতুন প্রাসাদ তৈরি করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ফলে প্রায় দু হাজার বছর পরে অ্যাক্রোপলিস প্রাসাদ-দুর্গের মর্যাদা লাভ করে। ডিউকের নির্মিত প্রাসাদটি কিন্তু একশ' বছর পরেই ভেঙে ফেলা হয়। পার্থেনন মন্দিরটি অবশ্য তখনও ক্যাথিড্রাল চার্চ বা 'Notre Dame d' Athenes' রূপে পরিচিত। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেণ্টাইন বণিকরা এথেন্স এবং অ্যাক্রোপলিস অধিকার করেন। তখনও পার্থেনন এথেন্স মহানগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীর্জা।

এবারে পঞ্চদশ শতাব্দীর কথায় আসছি। এটি তুর্কী আক্রমণের কথা। তুরস্ক আমাদের অন্যতম নিকট প্রতিবেশী। এই তুরস্কের ওপর দিয়েই মহাবীর আলেকজান্দার একদিন তাঁর অজেয় সেনাবাহিনী নিয়ে পারস্য জয় করে ভারত সীমান্তে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যের পরিহাস সেই পারস্য এবং তুরস্ক আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। পারস্যের কথা সংক্ষেপে বলেছি। এবারে তুরস্কের প্রসঙ্গে আসছি।

১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের অটোমান সেনাবাহিনী এথেন্স অধিকার করে নেয়। আর তারপরেই তারা তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পার্থেনন গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। সেখানেই শেষ নয় তুরস্কের সেনাপতি এরেখথিয়ন মন্দিরকে তাঁর হারেমে পরিণত করেন।

এইভাবে শ' দুয়েক বছর অতিবাহিত হয়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি অ্যাক্রোপলিসের প্রপিলেয়া (Propylaia) মন্দিরটির ছাদ বাজ পড়ে কিম্বা কোন গোলার বিস্ফোরণে উড়ে যায়। কিন্তু এই শতকেই পশ্চিম য়ুরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র বিশেষ করে ফরাসী দেশের সঙ্গে এথেন্সের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই (Louis) এথেন্সে একজন

দূত প্রেরণ করেন। তাঁর নির্দেশে জনৈক ফরাসী শিল্পী এথেন্সের প্রাচীন মন্দিরসমূহের বিশেষ করে পার্থেনন মন্দিরের বিশদ নকশা অঙ্কন করেন। সেইসব সচিত্র নকশা দেখেই আমরা একালে ধ্বংস-প্রাপ্ত অ্যাক্রোপলিসের সঠিক গড়ন ও উন্নত নির্মাণশৈলীর কথা জানতে পারি।

এর মাত্র তেরো বছর পরে অর্থাৎ ১৬৮৭ সালে একদল ভিনিসীয় (Venitian) সৈন্য এথেন্স আক্রমণ করে। তারা পেলোপনিস (Peloponnese) উপদ্বীপ অধিকার করে এথেন্সে আসে এবং অ্যাক্রোপলিস অবরোধ করে। তারা কামানের গোলায় অ্যাক্রোপলিসে অবস্থানরত তুর্কী সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অবস্থার বিপাকে তুর্কীরা তখন পার্থেনান মন্দিরকে গোলা-বারুদের গুদামে পরিণত করেছে। ভিনিসীয়দের গোলা গিয়ে পড়ল সেখানেই। ফলে বিশ্বইতিহাসের এই প্রাচীনতম প্রাসাদটির ছাদ উড়ে যায়। সেই বিস্ফোরণ এতই শক্তিশালী হয়েছিল যে তুর্কী সৈন্যরা ভয় পেয়ে অ্যাক্রোপলিস থেকে নেমে এসে ভিনিসীয়দের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। ভিনিসীয়রা তখন অ্যাক্রোপলিস অধিকার করে নেয়। তারা অ্যাক্রোপলিস থেকে বহু মূর্তি দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা বেশিদিন অ্যাক্রোপলিস অধিকার করে রাখতে পারে না। তাতে অবশ্য গ্রীকদের পরাধীনতার অবসান হয় না।

ভিনিসীয়রা যে অপহরণের প্রবর্তন করে, তাও আর বন্ধ হয় নি। তুর্কীরা আবার দখল নিয়ে অ্যাক্রোপলিসের মূর্তি ও অন্যান্য মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি বিদেশীদের কাছে বিক্রি করতে থাকে। আর তা চলে প্রায় শ'খানেক বছর ধরে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও তুরস্কের সুলতানের অনুমতিতে বৃটিশরা এখান থেকে বহু মূল্যবান মূর্তি ও নিদর্শন বৃটেনে নিয়ে যান। সেগুলো এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত রয়েছে।

নিজের অলক্ষ্যেই আমি মাথা নেড়ে ফেলি। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে সুপিন আমাকে প্রশ্ন করে বসে—তুমি সেগুলি দেখে

এসেছো আঙ্কল ?

—হ্যাঁ।

—আমি দেখি নি।

—কেন ?

—আর ব'লো না। জানো আমার প্রায় তিনবছর বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে আমরা এই দ্বিতীয়বার বেড়াতে বের হলাম। প্রথমবার দেশে গিয়েছিলাম আর এবারে এই গ্রীসে এলাম। এখান থেকে রোম ও আমস্টারডাম হয়ে স্টক্‌হোম যাবো, সেখান থেকে জেড্ডায় ফিরব। লণ্ডন যাওয়া হবে না আমাদের, সময় নেই।

—বেশ তো, স্টক্‌হোম না গিয়ে এবারে লণ্ডন ঘুরে যাও।

—তা হবার উপায় নেই আঙ্কল !

—কেন ?

—স্টক্‌হোম যে ওর জন্মভূমি।

আর কোন পরামর্শ দিতে পারি না। সত্যই তো, লণ্ডন যতবড় শহরই হোক, বৃটিশ মিউজিয়ামে গ্রীকভাস্কর্যের যত মূল্যবান সংগ্রহই থেকে থাক, তার গুরুত্ব জন্মভূমির চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাই চন্দ্র সস্ত্রীক তার জন্মভূমি দর্শন করতে যাচ্ছে।

খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি ? আমি আজ য়ুরোপে এসেছি, এথেন্স মহানগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জীবনদেবতার অসীম করুণায় আমি দেশ-বিদেশের কত জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু কলকাতা থেকে মাত্র ২১৩ মাইল দূরবর্তী আমার ছেড়ে আসা জন্মভূমি বরিশাল শহরে আর যেতে পাবি নি !

পাছে ভাবনাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। তাই তাড়াতাড়ি গাইডের দিকে তাকাই। তার কথা শুনে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে চাই। তিনি বলে চলেছেন—১৮২১ সালে গ্রীসবিপ্লব শুরু হয়ে যায়। অনতিকাল পরেই এথেন্স ও অ্যাক্রোপলিস তুর্কী কবলমুক্ত হয়। প্রায় পৌনে চারশ' বছরের পরাধীনতার অবসান ঘটে। গ্রীস স্বাধীন হয়।

—পৌনে চারশ' বছর ধরে আপনারা পরাধীন ছিলেন ? জনৈক

জাপানী পর্যটক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাইড উত্তর দেন—১৪৫৫ সাল থেকে। প্রকৃত পক্ষে তুর্কীরা অ্যাক্রোপলিস ছেড়ে চলে যায় ১৮৩৩ সালে। মানে ৩৭৭ বছর অ্যাক্রোপলিস তুর্কী অধিকারে ছিল।

গাইড আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন—তুর্কী কবলমুক্ত হবার কিছুকাল পর থেকেই অ্যাক্রোপলিসে সংস্কারকার্য শুরু হয়ে যায়। ১৮৮০ সাল থেকে জনৈক জর্মন পুরাতাত্ত্বিকের পরিচালনায় খননকার্য আরম্ভ করা হয়। কিন্তু ১৮৮৪ সালে এক ভূমিকম্পের ফলে এই খননকার্য বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৮ সালে আবার খননকার্য ও সংস্কারসাধন শুরু হয়। সেই থেকে সুদীর্ঘকাল নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম করে অ্যাক্রোপলিসকে দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে গঠিত হয়েছে একটি কর্মপরিষদ। তাঁরাই এখন অ্যাক্রোপলিসের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন।

থামলেন গাইড। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। একটু বাদে তিনি আবার বলতে শুরু করেন—লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন! অ্যাক্রোপলিস পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন। সুতরাং তার ইতিহাস অনেক অনেক বড়। আপনারা অ্যাক্রোপলিস দেখতে চলেছেন। তাই আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদের সে ইতিহাস বললাম। ভরসা করি, এর থেকে সুপ্রাচীন প্রাসাদপুরী সম্পর্কে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা হল।

আমরা মাথা নাড়ি। আর তখুনি গাড়ি থেমে যায়। গাইড উঠে দাঁড়ান। বলেন—কিন্তু আর কথা নয়। আমরা পৌঁছে গিয়েছি। ঐ দেখুন, অ্যাক্রোপলিস হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আসুন, তাকে দর্শন করা যাক।

পাঁচ

বাসে বসে কিছুক্ষণ আগে অ্যাক্রোপলিসকে দেখেছিলাম। দেখছি গাছে ছাওয়া সামান্য উঁচু একটা পাহাড়ের ওপরে গুটিতিনেক পৃথক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।

এখন বাস থেকে নেমে কিন্তু তাকে অন্যরকম দেখছি। তবে অ্যাক্রোপলিসকে একটু বাদে দেখা যাবে। তার আগে যেখানে বাস থেকে নেমেছি, সেই জায়গাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

প্রশস্ত ও মসৃণ একটা পথের পাশে বাস থেমেছে। আমাদের সামনে আরও কয়েকখানি গাড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে। তার মানে এটা অ্যাক্রোপলিসের 'কার-পার্ক'।

তখন অ্যাক্রোপলিসের পাহাড়টির গায়ে সবুজ গাছ দেখেছি। এখন সেই পাহাড়ের পাদদেশে আর পথের পাশেও প্রচুর গাছপালা দেখতে পাচ্ছি। পাইন ও সাইপ্রেস গাছই বেশি। তবে অন্যান্য গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ও রয়েছে।

আমাদের ঠিক উল্টোদিকে অ্যাক্রোপলিসে উঠবার চড়াই পথ। সংকীর্ণ হলেও একখানি গাড়ি অনায়াসে যেতে পারে। কিন্তু ভি. আই. পি. ছাড়া কাউকে গাড়ি নিয়ে ওপরে যেতে দেওয়া হয় না। ফলে পথটি প্রায় হাঁটাপথের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বড় রাস্তা পার হয়ে সেই পায়েচলা পথটির দিকে এগিয়ে চলি। এখানে বড় রাস্তার ওপরে একটি আয়তক্ষেত্রাকার পাথর বাঁধানো দ্বীপ। সেখানে গুটিকয়েক ঝোপঝাড় আর একখানি গোলাকার সাইনবোর্ড। অ্যাক্রোপলিসের পথ নির্দেশ। দ্বীপ পার হয়ে পায়েচলা পথটিতে পৌঁছই। পথের শেষে পাহাড়ের ওপরে অ্যাক্রোপলিস। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, পথের দুদিকেও তাই।

পথটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে। আমরা গাইডের পেছনে

চড়াই ভাঙতে শুরু করি। বলা বাহুল্য চন্দ্র আর সুপিন আমার পাশে পাশে পথ চলেছে।

অ্যাক্রোপলিসের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে। পথের বাঁদিকে অনেকটা উঁচুতে একটা বাড়ি আর পথের শেষে উচু সমতলে দুটো। তাদের পেছনে খানিকটা দূরে একটা ভারী সুন্দর সবুজ পাহাড়।

আমাদের তিনদিকেই শহর, মহানগরী এথেন্স। তাহলেও এখানে অ্যাক্রোপলিসের চৌহদ্দির মধ্যে কিন্তু কোন বাড়ি-ঘর নেই। পবিত্র ঐতিহাসিক স্থানটিকে জনারণ্য থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। আর তাই জায়গাটি কেবল ঐতিহাসিকদের নয়, প্রত্যেক সৌন্দর্যপ্রিয় পর্যটকের। যেমন রমণীয়, তেমনি শান্ত ও নির্জন। পথের পাশে ঝোপঝাড়ে বুনোফুলের সমারোহ আর গাছের শাখায় শাখায় পাখিদের কাকলি।

এটা অ্যাক্রোপলিসের পশ্চিম দিক। আমরা পাথর বাঁধানো প্রশস্ত পায়েচলা পথটি বেয়ে আস্তে আস্তে পুবদিকে চলেছি।

কয়েক মিনিট বাদেই ডানদিকের সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে পৌঁছে যাই। গাইড বলে প্রপিলেয়া।

কেবল মন্দির নয়, সেই সঙ্গে প্রাসাদ। এখন কেবল কয়েকটি স্তম্ভ ও দেয়ালের কিছু অংশ আর ধাপকয়েক সিঁড়ি অবশিষ্ট। তাহলেও প্রাসাদপুরীর বিশালত্ব বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাই গাইড বলেন—'The Complex of the Propylaia.

তার মানে এই ভগ্নাবশেষ একটি বাড়ির নয়, কয়েকটি বড় বড় বাড়ি ছিল এখানে। এখন কোনটাই অক্ষত নেই। তাহলেও তাদের পৃথক অস্তিত্ব বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বাঁধানো পথ থেকে একটা কাঁচা পায়েচলা পথ ধরে উঠে আসি কয়েক পা। তারপরেই সিঁড়ি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল সেকালের সিঁড়ি। এখন সেই ভাঙা সিঁড়ির ডানদিকে মাত্র ১৫।২০ ফুট চওড়া নতুন একসারি সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি।

চলতে চলতে গাইড বলছেন—দেখেই বুঝতে পারছেন, সামনে একটি ও দুপাশে দুটি অট্টালিকার মাঝখানে ছিল সেই সুবিশাল সোপানশ্রেণী। একই সোপান বেয়ে তিনটি প্রাসাদেই যাওয়া-আসা করা যেত। আর এই সিঁড়ির সমান্তরাল হল বাড়িগুলোর বেসমেণ্ট অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ অংশ। বাড়িগুলো দু-তিন তলা উঁচু ছিল। এখন কেবল একতলার কিছু অংশ ও দোতলায় দুখানি ঘরের ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে।

আমরা দেখি। ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের আকারে আমাদের তিনদিকেই বাড়ির ভগ্নাংশ। স্তম্ভই বেশি। কোন জায়গায় দেয়াল ও ছাদের কিছু অংশ রয়ে গিয়েছে। তুলনায় ডানদিকের বাড়িটা কম ক্ষতিগ্রস্ত। এরই দোতলায় একখানি ঘরের দেওয়াল ও স্তম্ভ-গুলি প্রায় সবই রয়ে গেছে।

সেইদিকে ইসারা করেই গাইড বলেন—নাইক (Nike) টেম্পল। খুবই সুন্দর ছিল মন্দিরটি।

আমরা আবার দেখি। মাঝারী আকারের একখানি চৌকো ঘর। সামনে চারটি গোলস্তম্ভ। পেছনেও তেমনি গোলস্তম্ভ রয়েছে। তবে তার একটি কেবল দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা নাইক মন্দিরের ঠিক নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। মন্দিরটি দোতলায় এখন ওখানে উঠবার উপায় নেই। তবে এখান থেকে বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। সামনে চার ধাপ পাথরের সিঁড়ি, তারপরে চারটি গোলস্তম্ভ। তাদের গা জুড়ে, বিশেষ করে মাথার ওপরে ভারী সুন্দর খোদাই কাজ। এখনও বেশ বোঝা যাচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছি এখান থেকেও।

থামগুলোর ওপরে একখানি করে পাতলা চৌকো পাথর। তার ওপরে নিরেট পাথরের মোটা কড়িকাঠ। সেগুলিও চৌকো। তাদের গায়ে একসারি মূর্তিমালা (Frieze)। মূর্তিগুলি অবশ্য অক্ষত নয়।

গোল থামগুলোর পরে বারান্দা, বেশি চওড়া নয়। তারপরেই

তিনদিকে দেয়াল ঘেরা গর্ভ মন্দির। সামনে দুটি চৌকো পাথরের থাম। কিন্তু মন্দিরের মাথায় ছাদ নেই!

গাইড বলেন—ছোট হলেও এই নাইক মন্দিরটি খুবই ঐশ্বর্যশালী ছিল। কারণ এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার মন্দির ছিল এটি।

বলা শেষ করেই গাইড আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

অবশেষে সবাই উঠে আসি ওপরে। নিচের দিকে তাকাই। সেই সুবিশাল সোপানশ্রেণী সেকালে প্রাসাদমালার উঠানের মতো ছিল। আর তখন ঘোড়ায় চড়েই এখানে পৌঁছন যেত।

নিচের থেকে বারো / তেরোটি থাম দেখা যাচ্ছিল। এখানে এসে দেখছি. আরও কয়েকটি রয়েছে। সবগুলোর অবশ্য সবটা নেই, কোন-কোনটির আধখানা কিম্বা তারও কম অবশিষ্ট। তাহলেও তাদের গড়ন দেখবার মতো।

সবই পাথর—সিঁড়ি থাম দেয়াল ছাদ সবই পাথরের। পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেকালে। তা দিয়েই কি কাণ্ড করেছিলেন সেই ধৈর্যশীল ও শ্রমশীল মানুষগুলো! স্থাপত্যবিদ্যায় কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অভিজ্ঞতা এবং কর্মকুশলতা তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন!

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। সবকিছুই পাথর দিয়ে তৈরি। একেবারে নিচের থেকে পাথরের ওপর পাথর গেঁথে তৈরি করা হয়েছে। বেসমেন্ট বেশ উঁচু, একতলাটিও তাই। তবে এর ওপরের তলা বোধকরি এত উঁচু ছিল না। কারণ নাইক মন্দিরটি এমন উঁচু নয়।

গাইড বলেন—যে তোরণ পেরিয়ে আমরা এখানে এলাম। তার নাম বিউলে (Beule) গেট।

বাড়িগুলোর মাঝখানের অংশই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কেবলই কয়েকটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাদ ও দেয়াল নেই। ছাদের খানিকটা অংশ রয়ে গিয়েছে দুপাশের বাড়ি দুটিতে।

কিন্তু ছাদ নয়, আমি দেখি স্তম্ভগুলি। এরা যে আমার অত্যন্ত পরিচিত। এমনি স্তম্ভ আমি দেখেছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হলের সামনে। দেখেছি ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটারে, দেখেছি বাকিংহ্যাম আর ভার্সাই প্রাসাদে। সেইসব স্তম্ভের আদিনিবাস এই অ্যাক্রোপলিস। আমি ভাগ্যবান, আজ সেখানেই এসেছি।

তাই ঘুরে রে কেবল থামগুলো দেখি। সত্যই দেখবার মতো। কেবল বিশাল নয়, সুন্দরও বটে। কত বুদ্ধি ও শ্রম, কত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেইসব স্থপতি ভাস্কর ও শ্রমিকগণ এগুলো তৈরি করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধায় বার বার মাথা নত হয়ে আসছে।

দেয়ালের গঠন নৈপুণ্যও অনুধাবন করবার মতো। যেমন সুন্দর, তেমনি মজবুত ও বৈচিত্র্যময়। এত আঘাতের পরেও যে সামান্য কয়েকটি দেয়াল অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলি সেকালের অতি উন্নত স্থাপত্যকলার উজ্জ্বল উদাহরণ রূপে পর্যটকদের প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছে।

একটি দেয়াল দেখে তো চমকে উঠতে হয়। এখনও আমরা কলকাতায় এই রকম বুটি তোলা সুদৃশ্য দেয়াল তৈরি করছি। গাইড দেয়ালটি দেখিয়ে বলছেন—'Section of the Propylaia, the east wall of the so-called Pinakotheke. The protruding "Knobs" are ancient. The beam-rests and openings derive from Frankish works when the building served as the palace of overlords.'

গাইড এগিয়ে চলেন। কিছুক্ষণ হেঁটে এসে পৌঁছই বাঁদিকে, প্রাসাদের মধ্যাঞ্চলে। এখানে দেখছি একটি স্তম্ভ ও দুদিকের দেওয়ালের সঙ্গে ছাদের খানিকটা অংশ রয়ে গিয়েছে। রয়েছে কারুকার্য খচিত পাথরের একখানি কড়িকাঠ। যেমন মজবুত, তেমনি সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে দর্শনীয় হল একই দেয়ালে পাশা-পাশি দুটি কাঠের দরজা। অপূর্ব খোদাইকাজ তাদের সারা অঙ্গে। হাজার-হাজার বছর ধরে প্রকৃতি ও মানুষের এত আঘাত সয়েও অক্ষত এবং অপরূপ।

অপরূপা প্রপিলেয়া দর্শন করে আবার নেমে আসি নিচে। সেই পাথর বাঁধানো পথ পেরিয়ে ডানদিকে চড়াই পথে এগিয়ে চলি। গাইড জানিয়েছেন, এবারে আমরা অ্যাক্রোপলিসের শ্রেষ্ঠ দর্শন পার্থেনন মন্দিরে চলেছি।

বাঁধানো পথ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু চড়াই ফুরলো না। এবরো-খেবরো পাথুরে পথ আর ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে এগোতে হচ্ছে। আমার একাধিক সঙ্গীও সঙ্গিনী আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। গাইড সহাস্যে তাঁদের ভরসা দেন—ভয় পাবার কিছু নেই। আছাড় খেয়ে ছড়ে গেলেও তেমন অসুবিধে হবে না। আমাদের বাসে ফার্স্ট এড বক্স আছে।

—এবং আমার ফার্স্ট এড্ ট্রেনিং নেওয়া আছে। গম্ভীর স্বরে সুপিন যোগ করে।

তার কথা শুনে আমরা অনেকেই হেসে উঠি। শেষ পর্যন্ত সুপিনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কেবল হাসল না চন্দ্র। সে গম্ভীর মুখে গাইডের পেছনে এগিয়ে চলেছে। বোধকরি চপলা স্ত্রীর রসিকতাটুকু ভাল লাগে নি তার।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য গাইডকে ফার্স্ট এড্ বক্স আনতে হয় নি এবং সুপিনকেও তার ট্রেনিঙের সদ্ব্যবহার করতে হল না। সবাই অক্ষত শরীরের পৌঁছে গেলাম অ্যাক্রোপলিসের মূল অংশে। পাহাড়ের ওপরটাকে সমান করে মালভূমির মতো সবিশাল প্রায় সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হয়েছিল। কোথাও মাটি, কোথাও ছোট ছোট গাছ। তবে বৃহত্তর অংশ জুড়েই পাথর—এখানকার বিভিন্ন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ! কত যুগাতীত কাল অসংখ্য মানুষের ধরে মহৎ সৃষ্টিকে হানাদারের দল মাটির সঙ্গে দিয়েছে মিশিয়ে। এগুলি কোন যাদু-ঘরে ঠাঁই পায় নি। তাই এখানে এমন অনাদরে আছে পড়ে। এরা যদি কথা কইতে পারত, তাহলে এদের কাছ থেকে মানবসভ্যতার সেই বিস্মৃত অতীতের কত কথাই না জানা যেত! মানুষ গড়েছে আবার মানুষ ভেঙেছে। আর তাই দেখে আজ মানুষের চোখে জল আসছে।

পাথর ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে এসে দাঁড়াই সেই প্রায় সমতল পাথুরে প্রান্তরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। আমাদের সামনে পার্থেনন (Parthenon) মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

কিন্তু পার্থেননের প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে তার চারদিকের কথা বলে নিই একটু। চারিদিক লোহার তার দিয়ে ঘেরা। ঘেরার ধারেও সারি সারি ছোট বড় পাথর। কোন-কোনটিতে খোদাই কাজ। পরিশ্রান্ত পর্যটকরা জোড়ায়-জোড়ায় কিম্বা দল বেঁধে বসে আছেন কোনটিতে। আবার কোন পর্যটক খুটিয়ে খুটিয়ে পাথরগুলো দেখছেন। বোধকরি ইতিহাসের কোন অকথিত কাহিনী খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু আমরা পরাধীন পর্যটক, কণ্ডাক্টেড বাসট্রিপে এসেছি। আমাদের যেমন বিশ্রামের অবকাশ নেই, তেমনি নেই কোন খোঁজা-খুজির অধিকার। অতএব গাইডের সঙ্গে তারের ঘেরা পার হয়ে একেবারে পার্থেননের সামনে এসে দাঁড়াই। তার দিকে তাকাই। সঙ্গে সঙ্গে সারাশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মহাকবি হোমার তাঁর মহাকাব্যে যে মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, থার্মোপালির যুদ্ধের পরে যে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সুমহান সক্রেতিস যে মন্দিরচত্বরে বসে দার্শনিক চিন্তায় আত্মহারা হয়েছেন, মহামতি আলেকজান্দার যে মন্দির দর্শন করেছেন, আমি আজ সেই মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার করুণাময় জীবনদেবতাকে পুনরায় প্রণাম জানাই।

গাইড বলে চলেছেন—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে এটি অ্যাক্রোপলিসের প্রধান প্রাসাদ ছিল। যদিও সে যুগে অন্যান্য অট্টালিকার মাঝে এটিকে এতখানি প্রভাবিত মনে হত না। এখন পাশের সব প্রাসাদগুলো একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ায় পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ আরও বেশি দর্শনীয় হয়ে উঠেছে।···

—এক্সকিউজ মী! জনৈক জাপানী পর্যটক গাইডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গাইড কথা থামিয়ে তাঁর দিকে তাকান।

পর্যটক প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এই পার্থেনন নামটির অর্থ কি?

গাইড উত্তর দেন—গ্রীক 'Parthenos' শব্দের ইংরেজী মানে 'Virgin' বা কুমারী। আপনারা জানেন প্রাচীন এথেন্সে কুমারী বলতে দেবী ভিনাস মানে এথেনাকে বোঝাতো। তিনি ছিলেন এথেন্সবাসীদের ইষ্টদেবী। 'It is, therefore, obvious that Parthenon means the temple or dwelling place of Athena Parthenos.'

পর্যটক খুশি হয়ে গাইডকে ধন্যবাদ জানান। গাইড আবার বলতে শুরু করেন—আমি বাসে বসে আপনাদের বলেছি যে অ্যাক্রোপলিসের নির্মানকার্য খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আরম্ভ হলেও এই মন্দিরটি প্রথম নির্মাণ করেন রিপাব্লিক অব্ এথেন্স। খ্রীঃ পূর্ব ৪৯০ সালে অর্থাৎ ম্যারাথন যুদ্ধজয়ের পরে এর নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং থার্মোপলি যুদ্ধের আগেই মানে খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ সালের আগেই মন্দিরটি সম্পূর্ণ নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরটিকেও সম্ভবত ম্যারাথন যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়। জ্যামিতির সাহায্য নিয়ে নির্মিত এটি পৃথিবীর প্রথম মন্দির। অত্যন্ত উন্নতমানের স্থাপত্যকলায় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এটি যেমন বিশাল, তেমনি অপরূপ ছিল। 'It spreads out majestically, it impresses the overwhelming spirit, the modesty and greatness and eternally acknowledged value of its art.'

একবার থামেন গাইড। তারপরে বলেন—কিন্তু আর বাইরে দাঁড়িয়ে কথা নয়। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।

গাইড আবার চলতে শুরু করেন। সহযাত্রীরাও এগিয়ে চলেন। আমি কিন্তু বিস্ফারিত নয়নে পার্থেননের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। আর সবিস্ময়ে অনুভব করি আমার শরীরের সেই শিহরণ এখনও থেমে যায় নি। বরং চোখ দুটি অশ্রু-সিক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমনটি তো হওয়া উচিত নয়। কাশীর

বিশ্বনাথ মন্দিরে, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমিতে, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানে অথবা কেদারনাথ কিম্বা অমরনাথে গেলে আমি কেন যেন চোখের জল সামলাতে পারি না। সে অশ্রু আনন্দ অথবা বেদনার, তাও জানি না। কিন্তু সে কান্না আমি এখানে কাঁদব কেন? কাশী অযোধ্যা মথুরা অমরনাথ ও কেদারনাথের সঙ্গে যে আমার নাড়ীর টান, রক্তের সম্বন্ধ।

তবুও এখানে এসে অবধি বারবার আমার চোখদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। কি জানি হয়তো আমার অবাধ্য মন এই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই সৃষ্টির মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করছে। আর সেই সঙ্গে মানুষের অমর মহত্বকে অবলোকন করছে। বুঝতে পারছে যে ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টি বড়, ঘৃণার চেয়ে প্রেম বড়, মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়।

ওরা সবাই এগিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পা চালাই। এদিকটা মন্দিরের প্রস্থ। কিন্তু মনে হয় এদিকটাই ছিল সামনের দিক। এদিকে ছ'টি আর দৈর্ঘ্যের দিকে আটটি স্তম্ভ রয়েছে দাঁড়িয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। মেঝে ভেঙে গিয়েছে, কোথাও ছাদ নেই। শুধু আছে চারিদিকের স্তম্ভ আর তাদের ওপর কয়েকটি কড়িকাঠ। কোথাও কোথাও দেয়ালের কিছু অংশ। এই টুকুতেই এর বিজ্ঞান সম্মত অপরূপ স্থাপত্যকলার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

আট/দশখানি গোলাকার পাথর পর পর সাজিয়ে এক-একটি স্তম্ভ। পৃথক পৃথক টুকরো হলেও এত নিখুঁত ভাবে তৈরি যে একটু দূর থেকেও মনে হয় যেন একখানি পাথর। প্রতি স্তম্ভের মাথায় একখানি করে চৌকো পাথর, স্তম্ভগুলির চেয়ে একটু বড়, চারদিকে কয়েক ইঞ্চি করে বেরিয়ে রয়েছে। এই পাথরগুলির ওপরেই বসানো হয়েছে কড়িকাঠ—চৌকো পাথরের পৃথক পৃথক খণ্ড। প্রত্যেকটি স্তম্ভের মাথায় দুদিকের দুটি কড়িকাঠ।

কড়িকাঠের উপরে সেই খোদাই কাজ—ফ্রিজ্। মানুষ ও প্রকৃতির এত আঘাত সইবার পরেও যা রয়ে গেছে। তা দেখেই স্থপতি, শ্রমিক ও শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে

আসছে। ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার, রাজা সৈনিক ও নর্তকীদের মূর্তি। শুধু বাইরে নয়। মন্দিরের ভেতরেও। এবং ভেতরের মূর্তিমালা তুলনায় অক্ষত।

গাইড বলেন—এদের চেয়ে অক্ষত ও ভাল মূর্তিগুলো সবই বিদেশীরা নিয়ে গিয়েছে। তার কিছু রয়েছে বৃটিশ মিউজিয়ামে বাকিটা ফ্রান্স, জর্মনী, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে। কিছু অবশ্য এখান থেকে নিয়ে নিচের অ্যাক্রোপলিস মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। আমরা যাবার পথে দেখে যাবো।

থামলেন গাইড। তারপরে বললেন—এবারে আপনারা নিজেরা একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নিন।

—আঙ্কল, সে কি গো! এযে ভূতের মুখে রামনাম! সুপিন বলে ওঠে।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। তারপরেই মনে পড়ে সে ইন্দোনেশিয়ার মেয়ে। ওদের দেশে রামায়ণ অতিশয় জনপ্রিয় মহাকাব্য। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছায়ার পুতুল-নাচ (Shadow Puppet) ওয়েআং কুলিত (Wayang Kulit) এখন ইন্দোনেশিয়ার লোকসংস্কৃতির একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

সুতরাং মৃদু হেসে ওর মন্তব্যটা উপভোগ করি আর ভাবি, ইন্দোনেশিয়ার একটি মুসলমান মেয়ে কথায় কথায় যে রামচন্দ্রের উল্লেখ করল, সেই রামচন্দ্রকে হিন্দু দেবতা বানিয়ে আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে।

যাক্ গে দেশের কথা। এদিকে গাইড আমাদের কিছুক্ষণ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার ছাড়পত্র দিয়ে নিজে নিষ্ক্রান্ত হলেন। সহযাত্রীরা যে যার আপনজনকে নিয়ে পায়চারি শুরু করেছেন। আমিও তাই করি। বলা বাহুল্য চন্দ্র ও সুপিন রয়েছে আমার সঙ্গে। এখন ওরাই আমার আপনজন। অথচ ঘণ্টাতিনেক আগেও পরিচয় ছিল না ওদের সঙ্গে।

আমরা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে মন্দিরে উঠেছি। কেবল এ-

দিকেই দেয়ালের খানিকটা অংশ রয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে স্তম্ভ গুলি অধিকাংশই ভাঙা। উত্তর ও পুবদিকের স্তম্ভগুলি কিন্তু সবই অক্ষত।

মন্দিরের মেঝেও মোটেই অক্ষত নয়। কোন-কোন জায়গায় তো পাথর তুলে নেওয়ায় গর্ত হয়ে আছে। কিন্তু যেখানে অক্ষত, সেখানে মেঝের মসৃণতা মুগ্ধ করে আমাদের।

ঘুরে ঘুরে দেখি। দেখি দেয়াল আর কড়িকাঠের মূর্তিমালা বা ফ্রিজ। দেখি মেঝে ও স্তম্ভ, দেয়াল কড়িকাঠ আর তাদের কারুকার্য। ভালো লাগছে সবই কিন্তু এখানেও আমাকে আকর্ষণ করছে স্তম্ভগুলি। এরা যে জড়পদার্থ নয়, এদের প্রাণ আছে। এরা মূক নয়, এরা কথা কইতে পারে। এরা আমার কানে কানে কত-কথা বলে চলেছে। বলছে মানব সভ্যতার কথা। বলছে মানুষের ভালোবাসা আর নিষ্ঠুরতার কথা। চার হাজার বছরেও যার কোন পরিবর্তন হয় নি। নইলে চন্দ্র আর সুপিনকে আমার এমন আপন মনে হবে কেন?

—হয়ে গেল। ঐ আসছে। আবার ছোটানো শুরু করবে।

সুপিনের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি গাইড এদিকে আসছেন। তার মানে ঘুরে বেড়ানোর পালা শেষ। এবারে আবার তাঁর পেছনে ছুটতে হবে।

না। গাইড আমাদের কাছে আসেন না। মন্দিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইসারায় কাছে ডাকেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর চারি-দিকে জড়ো হই। তিনি বলতে শুরু করেন—এই মন্দিরে ছিল দেবী এথেনার দণ্ডায়মানা অপরূপা বিগ্রহ। তাঁর মাথায় মণিমাণিক্য খচিত সোনার মুকুট। গায়ে মূল্যবান রেশমের চমৎকার পোশাক, পায়ে পাদুকা। বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে তিনি দুর্বলকে রক্ষা করতেন আর অত্যাচারীকে শাসন করতেন।

দেবী এথেনার বিগ্রহ ছাড়া আরও অসংখ্য ছোট-বড় অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্তি দিয়ে সাজানো ছিল এই মন্দির। 'The sculpted decoration covered every available surface, every

part of the building amenable to such embellishment within the limits which Greek sensivity permitted.'

মূর্তিগুলোর বিষয় বৈচিত্র্যও ছিল লক্ষ্য করার মতো। পুব-দিকের বিষয় ছিল দেবাসুরের (Gods and Giants) সংগ্রাম, উত্তরদিকে ট্রয়নগরী অবরোধ, পশ্চিমে অ্যামাজনদের বিরুদ্ধে গ্রীক অভিযান আর দক্ষিণের অংশে ছিল সেণ্টুরদের সঙ্গে সংগ্রামরত বীর-বৃন্দের মূর্তি।

—সেণ্টুর কি আস্কল ? গাইড থামতেই সুপিন প্রশ্ন করে।

আমি উত্তর দিতে পারার আগেই গাইড বলেন—গ্রীক পুরাণের এক কল্পিত প্রাণী। যার ওপরের অংশ মানুষের মাথা মুখ কাঁধ বুক ও দুখানি হাত আর নিচের অংশে দুটি পা ও লেজ সহ ঘোড়ার শরীরের শেষার্ধ।

—সেসব মূর্তি এখন কোথায় ? সুপিন আবার জিজ্ঞেস করে।

গাইড উত্তর দেন—অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যা অক্ষত ছিল, তা প্রায় সবই বিদেশে বিশেষ করে বৃটেনে নিয়ে গিয়েছে। সামান্য যা কিছু এখানে পাওয়া গেছে, তা রাখা হয়েছে অ্যাক্রোপলিস মিউজিয়ামে।

একটু থেমে একখানি হাত বাড়িয়ে গাইড আবার বলতে থাকেন ঐটে হচ্ছে মন্দিরের পেছন দিক। ঐ অংশটা ছিল এথেন্স রাজ্যের রাজকোষ অর্থাৎ জনসাধারণের কোষাগার (Exchange of Athena)। গণতান্ত্রিক সরকারের সম্পদকে দেবী এথেনার সম্পত্তি বলে মনে করা হত। এই মন্দিরই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ স্থান, পবিত্রও বটে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩৯ সাল থেকেই পার্থেনন মন্দিরের কতৃপক্ষ এই কর্তব্য পালন করে আসছিলেন।

থামলেন গাইড। একবার একটু হাসলেন। তারপরে বললেন—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, গাইডের কাজ করতে এসে মাঝে মাঝেই যে অপ্রিয় কথাটি বলতে হয়, আমাকে এবারে সেটি বলতে হবে।

—কী ?

—এবারে বিদায় নিতে হবে বিশ্বের এই প্রাচীনতম মন্দির থেকে আমরা এবারে এরেখথিয়ন (Erechtheion) মন্দির দেখে মিউজি-য়ামে যাবো।

বলা শেষ হতেই ভদ্রলোক বড়-বড় পা ফেলে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। অগত্যা আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। বেরিয়ে আসি পার্থেনন মন্দির থেকে।

আগেই বলেছি মালভূমি সদৃশ এই সুবিশাল প্রায় সমতল পাথুরে প্রান্তরের একপাশে পার্থেনন মন্দির। বাকি প্রায় সবটা জুড়েই ধ্বংসস্তূপ কেবল ঐ উঁচু জায়গাটায় কয়েকটি স্তম্ভ এবং খানিকটা দেয়াল দেখতে পাচ্ছি। বোধকরি ওটাই এরেখথিয়ন মন্দির। কারণ গাইড ওদিকেই চলেছেন।

চলতে চলতে একটা ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন গাইড। বললেন—খ্রীষ্টপূর্ব ২৭ সালে রোমসম্রাট অগাস্টাস সীজার এখানে রোমাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রোমা ছিলেন রোমের ইষ্টদেবী।

একটু নিচু হয়ে ভগ্নস্তূপ থেকে একটুকরো পাথর তুলে নিয়ে বললেন—দেখুন, এই পাথরের সঙ্গে এখানকার অন্য কোন মন্দিরের পাথরের মিল নেই। কারণ সম্রাট অগাস্টাস অন্য কোন জায়গা থেকে এই পিণ্ডীভূত (Conglomerate) পাথর আনিয়ে মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। এ পাথর এখানে পাওয়া যায় না। এখানকার অন্যসব মন্দির সচ্ছিদ্র পাথর (Poros-stone) দিয়ে তৈরি হয়েছে।

কয়েকজন সহযাত্রীর দেখাদেখি সুপিনও একটুকরো পাথর তুলে নেয়। তারপরে বিশেষজ্ঞের ভঙ্গিতে বলে—সত্যই আঙ্কল, এ পাথরগুলো অনেক মসৃণ ও উজ্জ্বল, ভারীও বটে!

—সিনিয়র জিওলজিস্ট! সহাস্যে চন্দ্র বলে ওঠে।

সুপিন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পাথরখানি ফেলে দেয়। আমি হাসতে হাসতে ওর হাত ধরে এগিয়ে চলি।

এখন আমরা উত্তরে চলেছি। মালভূমির এদিকটা অপেক্ষাকৃত

উঁচু এবং পাথুরে। সামনের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা দেখিয়ে গাইড বলেন—ওখানটা সমুদ্রসমতা থেকে ১৫৬ মিটার উঁচু। ওখানেই ছিল জিউস-পলিউস (Zeus-Polieus) মন্দির।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আরও খানিকটা এগিয়ে এরেখথিয়ন মন্দিরের সামনে আসি। অবশ্য এখন মন্দির বলতে কয়েকটি স্তম্ভ ও কড়িকাঠ, কার্নিস ও সিলিঙের কিছু অংশ।

গাইড বলেলন—দেবরাজ জিউসের ভাই সাগরদেবতা এরেখথিউস বা পজিডনদেবের মন্দির ছিল এখানে। রোমানরা তাঁকে বলেন 'নেপচুন।' সউনিয়ন দেখতে গেলে আপনারা তাঁর অনেক কথা জানতে পাববেন।

এটা মন্দিরের পশ্চিমদিক। এদিকে রয়েছে কয়েকটি গোল ও চৌকো থাম আর তাদের ওপরের কিছু অংশ। থামগুলোর গায়ে ভারী সুন্দর খোদাই কাজ।

কিন্তু গাইড আমাদের সেদিকে এগুতে দেন না। বলেন—এদিক দিয়ে নয়, আসুন আমরা ঐ পুবদিক দিয়ে ভেতরে যাই।

তাঁকে অনুসরণ করি। হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেন—খ্রীষ্টপূর্ব ৪২০ সালে এই মন্দির তৈরি শুরু হয়েছিল। তবে তার আগেও এখানে একটি মন্দির ছিল। সেই পুরনো মন্দিরের পাশেই এই মন্দির তৈরি করা হয়। এ মন্দিরটির গঠন-প্রণালী বেশ জটিল এবং নির্মাণ কৌশল অন্যান্য মন্দিরের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। এই মন্দিরের প্রথম বৈশিষ্ট্য এটি দুটি স্তরে নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত মন্দিরে প্রবেশ করেই পর পর দুটি বারান্দা পার হতে হত। একটি উত্তর-দক্ষিণে অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিমে।

আগেই বলেছি মন্দিরের দুটি অংশ দুটি স্তরে নির্মিত হয়েছিল। পুবদিকের উচ্চতর অংশে ছিল দেবী এথেনার মন্দির। আপনারা সবাই বোধকরি জানেন, দেবী এথেনা হলেন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কৃষিসম্পদের লৌকিক দেবী। এ মন্দির তৈরি হবার আগে পাশের সেই প্রাচীন মন্দিরে তাঁর পুজো হত।

পশ্চিমদিকের ঐ নিচু অংশে ছিল এরেখথিউসদেবের (Posei-don-Erechtheus) মন্দির। দুটি অংশের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল কিনা জানা যায় না। না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ এই দুই দেব ও দেবীর মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। মাঝে মাঝেই যুদ্ধ বেঁধে যেত।

একবার একটু থামলেন গাইড। তারপরে হাত বাড়িয়ে বলেন —আসুন, আমরা এই পুবদিক দিয়ে ভেতরে যাই।

তাঁর পেছনে এগিয়ে চলি। বড় বড় পাথর আর ভাঙা পাথরের স্তূপ পেরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। একটু এগিয়েই একসারি স্তম্ভ। তাই দেখিয়ে গাইড বলেন—এটাই ছিল মন্দিরের প্রধান প্রবেশ তোরণ। এখন পাঁচটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। সেকালে আরও একটি ছিল। সেটি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে।

তোরণ পার হয়ে আসি। হতাশ হতে হয়। প্রকৃত পক্ষে সবই বিধ্বস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত। এমন কি মন্দিরটির চৌহদ্দি যে আয়তক্ষেত্রাকার ছিল, তা পর্যন্ত বুঝতে পারছি না।

তার ওপরে গাইড ভেতরের ভগ্নস্তূপগুলি দেখিয়ে বলছেন—এগুলো ঠিক কোন্ মন্দিরের তা বলা সম্ভব নয়। কারণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ মন্দির গীর্জায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তখন এর প্রচুর সংস্কার সাধন করা হয়। সেই গীর্জার ধ্বংসাবশেষও এখানে মিশ্রিত রয়েছে।

কথিত আছে, এটি যখন দেবী এথেনার মন্দির, তখন এখানে দেবীর দারুমূর্তি পুজো করা হত। 'অলিভ' কাঠের সেই বিগ্রহটি মানুষ তৈরি করেন নি, তিনি স্বর্গ থেকে পড়েছিলেন। দেবীমূর্তি বহু মূল্যবান মণিমুক্তো দিয়ে সুসজ্জিতা ছিলেন।

তাই বলে পশ্চিমাংশের এরেখথিয়ন মন্দির কিছু কম পুণ্যক্ষেত্র ছিল না। ওখানেই নাকি দেব-দেবীর সংঘর্ষ হত। অর্থাৎ দেবী দেবকে আক্রমণ করতেন।

—খুবই স্বাভাবিক। শান্ত স্বরে চন্দ্র মন্তব্য করে।

—মোটেই নয়। সুপিন প্রতিবাদ করে—ওটা অস্বাভাবিক। কারণ চিরকাল ছেলেরাই মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে।

দুজনেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমি কি বলব বুঝতে পারছি না। মেয়ের পক্ষ নিলে জামাই অসন্তুষ্ট হবে। আবার জামাইকে সমর্থন করলে মেয়ে অভিমান করবে।

কিছুই বলতে হয় না আমাকে। গাইড বাঁচিয়ে দেন। প্রায় ধমকের স্বরে বলে ওঠেন—একি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন, এদিকে আসুন! এখন এই সিঁড়ি ভেঙে উত্তরদিকে ঐ রক্ষাপ্রাচীরের কাছে যেতে হবে। এগুলো কিন্তু সেকালের সিঁড়ি নয়, পর্যটকদের সুবিধের জন্য একালে তৈরি করা হয়েছে। তবে সেকালেও এখানে একসারি সিঁড়ি ছিল।

নীরবে গাইডের সঙ্গে নেমে আসি নিচে। এসে পৌঁছই একফালি আঙ্গিনায়। ঠিক মাঝখানে একটি অলিভ গাছ।

গাছটির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন গাইড। তারপরে শুরু করলেন —যে কথা বলছিলাম, এখানেই দেব ও দেবীর মাঝে সেই প্রবল সংগ্রাম হয়েছিল। দেবী এথেনা সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তারপরে তিনি নাকি তাঁর বল্লম দিয়ে পাশের ঐ পাথরটাকে আঘাত করতেই একটি রুপোলী-সবুজ ফলবান অলিভ গাছ এখানে দেখা দিয়েছিল।

বহুকাল ধরে গাছটি ছিল এখানে। তারপরে খৃষ্টপূর্ব ৪৮০ সালে পারস্যবাহিনী যখন এই মন্দির পুড়িয়ে দেয়, তখন সেই গাছটিও পুড়ে যায়। কিন্তু পরদিনই নাকি পোড়া গাছের গোড়ায় আরেকটি গাছ গজিয়ে ওঠে। সে গাছটিও ছিল বহুকাল। তারপরে এক-সময় মরে যায়। ঠিক সেখানেই কিছুকাল আগে রাণী সোফিয়া এই গাছটি রোপণ করেছেন।

আমরা দেখি। গাছটি সবুজ সতেজ ও সুন্দর। তার শাখায় শাখায় ফল আর পাতার বাহার। ভারী ভাল লাগছে তাকে। আমি দেখি আর ভাবি!

এই গাছ গ্রীক সংস্কৃতির ধারক আর সংহতির বাহক। এর

সঙ্গে ওলিম্পিকের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। সেকালে ওলিম্পিক উৎসবে বিজয়ীদের কেবল এই গাছের পাতা দিয়েই পুরস্কৃত করা হত। তাঁদের কোন স্বর্ণপদক কিম্বা অন্য কিছু দেওয়া হত না। তাহলেও তাঁরা অলিভপাতা পুরস্কার পেয়ে কৃতার্থ বোধ করতেন। কারণ অলিভ পাতা ছিল পরম পবিত্রতার প্রতীক, আর খেলাধূলা ছিল কেবল খেলাধূলার জন্যই।

আমাদের দেশেও গাছ দেবতার আয়তন। গাছের পাতা পরম-প্রসাদ। তাই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে স্নাতকদের হাতে একদিন সপ্তপর্ণী বা ছাতিম পাতা তুলে দিয়েছিলেন। দেওয়া কিন্তু আজও হয়, ওলিম্পিকে অলিভ পাতা আর শান্তিনিকেতনে ছাতিম পাতা। কিন্তু প্রাপকরা তাতে আর এখন তেমন পুলকিত বোধ করেন না। না করারই কথা। কারণ এই বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বে এগুলো এখন কেবলই নিয়মরক্ষা। গাছের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অথবা পাতার প্রতি আমাদের মমত্ব এযুগে সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে।

গাছের ভাবনা থামিয়ে গাইডের কথা শুনতে হয়। গাইড বলছেন—এবারে আপনারা এই উত্তরদিকের স্তম্ভগুলি দেখুন। এদের গঠনশৈলী নিঃসন্দেহে নাইক টেম্পল কিম্বা প্রপিলেয়ার চেয়ে উন্নত মানের। দেখুন, ওপরের দিকে কি সুন্দর খোদাই কাজ। বিশেষ করে ঐ ফুল ও লতাপাতাগুলি, যেন জীবন্ত। এগুলি কিন্তু সবই আগুনে ঝলসে গিয়েছে। তবু মনে হচ্ছে যেন হালে খোদিত. এদের ওপর মহাকালের করাল ছায়া পড়ে নি। ঐতিহাসিকরা বলেন, এ মন্দির পার্থেননের পরবর্তী যুগে নির্মিত। এবং তখন গ্রীক শিল্পকলা খুবই উন্নত।

কথাটা যে মিথ্যে নয়, একটু বাদে তা আরও ভাল করে বুঝতে পারি। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠি।

গাইডের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিধ্বস্ত এরেখথিয়ন মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এসেছি। এসেছি একটি ছোট মন্দিরের সামনে। গাইড জানিয়েছেন, এ মন্দিরটির নাম কারিয়াতাইদিস (Karyatides)।

আর সেটি দেখেই আমরা বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠেছি।

পুলকিত হবার মতই বটে। অ্যাক্রোপলিসে পৌঁছবার পর থেকেই বিভিন্ন বিধ্বস্ত মন্দিরের অপেক্ষাকৃত অক্ষত স্তম্ভগুলি বার বার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। খণ্ড খণ্ড নিরেট পাথর দিয়ে তৈরি স্তম্ভ, বিশেষ করে গোলাকার স্তম্ভগুলি সত্যি দেখবার মতো। কিন্তু সেগুলিও এদের মতো বিচিত্র-সুন্দর নয়।

হ্যাঁ, মূল্যবান পাথরের অনিন্দ্যসুন্দর নারীমূর্তি হলেও এরা স্তম্ভ বৈকি! কোমরসমান রেলিঙের ওপরে দাঁড়িয়ে তারা মন্দিরের ছাদটিকে মাথায় করে রেখেছে। কি জানি, ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই হয়তো হানাদারদের দল ছাদটি ভেঙে ফেলে নি! সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

তাহলেও এরা কিন্তু হানাদারদের পাশবিক অত্যাচার থেকে রেহাই পায় নি। কেউ অক্ষত নয়। সবারই শরীরে ক্ষতচিহ্ন। মাথায় মুখে বুকে পেটে পায়ে পাশবিকতার ছাপ। কোন জায়গাটি ভেঙে গেছে, কোনখানে বা গর্ত হয়ে আছে। আর কারও হাত নেই।

তবু এদের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে আমাকে। যেমন মুখশ্রী তেমনি দেহের গঠন, যেমন পোশাক তেমনি অলঙ্কারের বাহার। সবারই মাথায় কারুকার্য-খচিত মুকুট। মুকুটের ওপরে কড়িকাঠ। সব মিলিয়ে ছ'টি মূর্তি। সামনে একসারিতে চারটি আর মাঝামাঝি জায়গায় একই সরলরেখায় দুদিকে দুটি। পেছনে মন্দিরের দেয়াল।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ওদের দেহের আয়তনগত সুষমতা। মূর্তি-গুলি লম্বায় নয়/দশ ফুট হবে। অর্থাৎ একজন মানুষের অন্তত দেড়গুণ। ঠিক সেই অনুপাতে নির্মিত। অর্থাৎ কোন স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতী যদি দশফুট লম্বা হয়, তাহলে তার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমনকি পায়ের আঙুলগুলির যা আকার হবে, ঠিক সেই আকারে নির্মিত।

আমরা দেখি বার বার দেখি। কেবল নারীমূর্তিদের নয়, সেই

সঙ্গে মন্দিরটিকেও। ছোট মন্দির। অথচ সিলিঙের কারুকার্য অপরূপ, তাকিয়ে থাকবার মতো।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকাবার অবকাশ কোথায়? গাইডের সঙ্গে চলা শুরু করতে হয়। চলতে চলতে গাইড বলেন—

—মহাকবি হোমারের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকেও এখানে এরেখথিয়ন মন্দিরটি ছিল! কারণ মহাকবি লিখে গিয়েছেন, 'Strong dwelling of Erechtheios' এবং 'wealthy temple'. তার মানে এ মন্দিরটি ছিল যেমন মজবুত, তেমনি ঐশ্বর্যশালী। পুজোর সময় এখানে গোবলি দেওয়া হত। আর তাই মন্দিরের আঙ্গিনায় একটা বেশ বড় কাঠগড়া পোতা ছিল।

একটু অবাক হই। তাহলে এদেশেও মোষবলির প্রচলন ছিল! তার মানে আবার আমার সেই কথাটি বলতে হয় যে, মহামতি আলেকজান্দার ভারতে আসার আগেও হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে হেলেনীয়দের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এবং ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মাঝে একটা ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান ছিল।

যাক্ গে, গাইডের কথা শোনা যাক। তিনি বলছেন—এরেখথিউস এথেন্সের প্রাচীনতম লৌকিক দেবতাদের অন্যতম। তিনি সেকালে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কারণ তিনি হলেন ভূমিকম্প ও সমুদ্রের দেবতা। যারা তাঁর অনুগত ভক্ত ছিলেন, তাঁদের বলা হত আটিকপন্থী (Attic religious belief).

তিনি দেবী এথেনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও শেষ পর্যন্ত নাকি দুজনের একটা সন্ধি হয়েছিল। তাহলেও তিনি কখনও আপন অহঙ্কার বিসর্জন দেন নি। অনেকে বলেন, তিনি নিজের ত্রিশূল দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। আবার অনেকের মতে দেবরাজ জুপিটার তাঁকে হত্যা করেন।

—আরেকটা কথা। গাইড প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন। বলেন —তুর্কী আমলে এই মন্দিরকেই তাঁদের রাজ্যপাল হারেমে পরিণত করেন। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মন্দিরটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। গত শতাব্দীর শেষদিকে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একে এই অবস্থায় পাওয়া গেছে।

থামলেন গাইড। কিন্তু কথা থামলেও চলা থামালেন না তিনি। আমরাও নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলেছি।

কিন্তু কোথায়? আমরা কি অ্যাক্রোপলিস থেকে চলে যাবো বলে পার্থেননের দিকে ফিরে চলেছি?

না। এখনও শেষ হয় নি অ্যাক্রোপলিস দর্শন। গাইডের পেছনে এসে দাঁড়াই মালভূমির দক্ষিণ প্রান্তে. একেবারে ঢালের ধারে। জায়গাটা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে উপত্যকায় মিশেছে। বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া উঁচু-নিচু উপত্যকা। কোথাও পাথুরে লালমাটি, কোথাও বা সবুজ ক্ষেত। সেই লালমাটির দিকে হাত দেখিয়ে গাইড বলেন—থিয়েটার অব্ ডায়োনিসস (Dionysos) খ্রীঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দে নির্মিত এই থিয়েটার বিশ্বে রঙ্গালয়-স্থাপত্যকলার জনক। পরে অবশ্য এটির বহুবার সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এখনও এটিতে সাতষট্টি-টি ধাপে তেরো হাজার দর্শকাসন রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, সামনের দিকের আসনগুলো আকারে বড় হেলান দেবার ব্যবস্থাটিও ভাল।······

—ওগুলো কি ভি. আই. পি গ্যালারী? মাঝখান থেকে স্থপিন বলে ওঠে।

গাইড মাথা নাড়েন। বলেন—হ্যাঁ। রাজকর্মচারী, পুরোহিত ও বিচারক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ওখানে বসতেন। এই রঙ্গমঞ্চে বছরে অন্তত আটটি নাটক অভিনীত হত, তিনটি ট্র্যাজেডি ও পাঁচটি কমেডি। আর হত মানুষে-মানুষে কিম্বা মানুষে-পশুতে সেই পেশাদার মরণসংগ্রাম, যাকে বলা হয় 'Gladiatorial Spectaclas'. ধনী নাগরিকরা যৌথভাবে এই রঙ্গালয়ের ব্যয়ভার বহণ করতেন।

হ্যাঁ, একটি মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চই বটে। চারিদিকেই পাহাড়ের ঢাল, মাঝখানে সমতল। সে জায়গাটুকু পাথর বাঁধানো—অর্ধ-বৃত্তাকার। তার একদিকে খানিকটা জুড়ে দেওয়াল আর তিনদিকে

পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে দর্শকাসন। এখন সবই ভাঙাচোরা এবং পরিত্যক্ত। তাহলেও সেকালের বিচারে পরিকল্পনাটি খুবই অভিনব। আমরা দেখি।

কিন্তু আগেই বলেছি আমাদের গাইড সময় সম্পর্কে সদাই সচেতন। তিনি তাগিদ দিলেন—আসুন এবারে ওপাশে ঐ পাহাড়ে দিকে গিয়ে দাঁড়াই। ওখান থেকে পাহাড় ও তার পাদদেশের পথটি যেমন সুন্দর দেখাবে, তেমনি আপনারা এথেন্স মহানগরীর অপরূপ রূপ দেখতে পাবেন। চলুন, এথেন্স ফিরে যাবার আগে ওপর থেকে তাকে একবার দেখে নেওয়া যাক।

পাহাড় মানে খানিকটা দূরের একটা বেশ লম্বা সবুজ টিলা। আমরা সেদিকে এসে দাঁড়াই। গাইড বলেন—নিচের সমতলের দিকে তাকিয়ে দেখুন আরেকটি রঙ্গমঞ্চ। আকারে ছোট কিন্তু প্রায় অক্ষত। ওটার নাম হেরোডিয়ন (Herodeion)

আমরা দেখি। আমাদের সোজাসুজি নিচে পথের প্রায় সমান্তরালে এই অ্যাক্রোপলিস পাহাড়টার গায়ে আরেকটি মুক্তাঙ্গণ রঙ্গমঞ্চ। বলা বাহুল্য অর্ধচন্দ্রাকার। তিনদিকে ওপর থেকে তলা পর্যন্ত দর্শকাসন আরেকদিকে একটা পুরনো উঁচু বাড়ি। নিচে মাঝখানে বাঁধানো রঙ্গভূমি।

বাড়িটার দুটি তলা মোটামুটি অক্ষত। গড়নটা সরু ও লম্বা। সারা গায়ে দরজা। বোধকরি ভি. ভি. আই. পি-দের বসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল ওখানে।

বাড়িটা সারানো হয় নি, কিন্তু বসবার আসন ক্রীড়াঙ্গণটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

গাইড বলেন—এটি অ্যাক্রোপলিসের দক্ষিণ ঢাল। এই মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে কেবল নাটক ও গান-বাজনা হত। ১৬১ খ্রীষ্টাব্দে রোমসম্রাট হাড্রিয়ানের অনুরোধে তাঁর স্থানীয় ধনী বন্ধুরা পাহাড় কেটে এই রঙ্গালয় নির্মাণ করান। ওখানে পাঁচ হাজার দর্শক বসতে পারতেন। বাৎসরিক গ্রীষ্মকালীন উৎসবে গান ও নাটকের আসর বসত। ১৭৯ গজ

লম্বা ঐ সরু বাড়িটা কিন্তু আগেই তৈরি করা হয়েছিল দার্শনিকদের জন্য। পরে ওটিকে রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ক্রীড়াঙ্গণের পরে ছোট-বড় গাছে ছাওয়া খানিকটা সমতল—পতিত জমি। তারপরেই একটি মসৃণ ও প্রশস্ত রাজপথ। অনবরত গাড়ি চলছে—ছোট বড় নানা রকমের গাড়ি। চলছে দুর্বার বেগে।

পথের ওপাশেও আরেকফালি সমতল। কিছু গাছপালা আর কিছু বাড়ি-ঘর—কল-কারখানাও হতে পারে। ওখানেও বাঁধানো পথ আছে। দাঁড়িয়ে আছে কয়েকখানি গাড়ি।

তারপরে সেই পাহাড়। এই অ্যাক্রোপলিসের পাহাড়টার চাইতে উঁচু এবং লম্বা, তবে বোধকরি চওড়ায় কম। আমাদের সোজাসুজি অংশটা অর্থাৎ যেখান থেকে পাহাড়টা শুরু হয়েছে, সেখানটাই সবচেয়ে উঁচু। তারপরে আস্তে আস্তে নিচু হয়ে ডাইনে প্রসারিত হয়ে শহরের সীমারেখায় পৌঁছে গিয়েছে ফুরিয়ে।

সামনের ঐ সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় বন কেটে বসত হয়েছে। বাকি সবটা জুড়েই বড়-বড় গাছ। গাছে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। ভারী সুন্দর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের গায়ে একটি আঁকা-বাঁকা পথ। মনে হয় পাহাড়টা গলায় মালা পরে আছে। আর সেই পথের পাশে দু-চারখানি ছবির মতো ছোট-ছোট বাড়ি।

গাইড জানান—এটি এথেন্সের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, ৪৮২ ফুট উঁচু। সামনে ঐ বনহীন শিখরে রয়েছে একজন সিরিয়ান রাজপুত্র ও একজন রোমান রাষ্ট্রদূতের স্মৃতিসৌধ, শ্বেতপাথরে নির্মিত। এই পাহাড়ের একটা গুহাতেই সুমহান সক্রেতিসকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেখানে বসেই হেমলক বিষ পান করে তিনি আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

আগেই বলেছি, সবুজ পাহাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শুরু হয়েছে শহর। এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে দূর-দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মহানগরী—উর্বশী এথেন্স। মানবসভ্যতার স্মৃতিকাগার এই মহানগরী। অভিশপ্তও বটে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে গত

শতাব্দী পর্যন্ত, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে হিংস্র হায়নার দল অসংখ্য আঘাত হেনেছে এর বুকে। মানুষ মেরেছে, বাড়ি ভেঙেছে, আগুন লাগিয়েছে। উর্বশী এথেন্সের পথে পথে রক্তগঙ্গা গিয়েছে বয়ে। স্বজন বিরহের ব্যথা বুকে বয়ে শান্তিকামী সুসভ্য এথেন্সবাসী খাদ্যের জন্য, পানীয়ের জন্য আশ্রয়ের জন্য হাহাকার করেছে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আকাশ। বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হত্যা লুণ্ঠন আর আগুন দিয়ে এথেন্সকে ধ্বংস করা যায় নি। সভ্যতার বিজয়রথকে দেওয়া যায় নি থামিয়ে।

তাই যুগে যুগে এথেন্সে আবির্ভূত হয়েছেন হোমার, সক্রেতিস প্লাতো আরিস্তোতল, আর্কিমিদিস ইউক্লিদ টলেমী, আরও কত বিশ্ব-বরেণ্য মনীষী।

উর্বশী এথেন্স! এতো আঘাত সয়েও তুমি আজ বেঁচে রয়েছ। কারণ তুমি যে মনুষ্য সভ্যতার সেই পরমাত্মা, যাকে অস্ত্রে ছিন্ন করা যায় না। অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, জলে সিক্ত কিম্বা বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না। তুমি অব্যয়, তুমি অবিনাশী।

তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল। বেঁচে থাকবে পাশ্চাত্য-পৃথিবীর শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদিপীঠ রূপে, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ রূপে, সভ্যতার সূতিকাগার রূপে।

আর তাই প্রাচ্য-সভ্যতার সূতিকাগার থেকে আমি আজ ছুটে এসেছি তোমার এই অ্যাক্রোপলিসে। এখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। উর্বশী এথেন্স, তুমি এই নগণ্য ভারত পথিকের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

ছয়

অ্যাক্রোপলিস থেকে নেমে এসে আমরা অ্যাক্রোপলিস মিউজিয়াম দেখেছি। দেখেছি মানে চোখ বুলিয়েছি আর গাইডের পেছনে ছুটেছি।

তারপরে আবার বাসে এসে উঠেছি। বাসে বসেই মডার্ণ মার্কেট, আলেকজান্দ্রা এভেন্যু, সোফিয়া এভেন্যু, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গ্রন্থাগার দেখে এই ওমোনিয়া স্কোয়ারে অর্থাৎ ট্যুর এজেন্টদের টার্মিনালে এসেছি।

বেশ কয়েকজন সহযাত্রী নেমে গেলেন এখানে। তারপরে বাস আবার চলতে শুরু করল। এরা আমাদের হোটেলে পৌঁছে দেবেন।

বিশ্বের প্রাচীনতম অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ দেখে ফিরে চলেছি হোটেলে। কিন্তু সারা মন জুড়ে এখনও রয়ে গিয়েছে অ্যাক্রোপলিস আর তার মিউজিয়ামের অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

যাদুঘরটি বয়সে নবীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ থেকে নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করে ওখানে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান নিদর্শনসমূহ তার অনেক আগেই বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। তবু গাইড বলেছেন, এটি বিশ্বের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যাদুঘর। তাঁর ভাষায়—'One of the most important Museums in the world.'

পুরাতত্ত্বের বিচারে কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। কারণ এখানে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শত শত নিদর্শন সংরক্ষিত।

আমি এই প্রথম এথেন্সে এলাম। আজই দর্শন করলাম অ্যাক্রোপলিস। অথচ এই মিউজিয়ামে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭০ অব্দের একটি পাথরের মূর্তি দেখে চমকে উঠেছি। কারণ শৈশবে পূর্ববঙ্গে

স্কুলে পড়ার সময় সেই মূর্তিটির ছবি দেখেছি। কোন্ বইতে মনে নেই। তবে ছবিটাকে ভুলে যাই নি। গাইড বলেছেন মূর্তিটির নাম 'মশোফোরোস' (The Moschophoros)। রমবোস (Romvos) নামে জনৈক ভক্ত কাঁধে একটি বাছুর নিয়ে দেবী এথেনার মন্দিরে বলি দিতে চলেছে। ভক্তটির মাথায় বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মতো উষ্ণীষ। তার সঙ্গে কয়েকটি মালা—ছ'কানের পেছন পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গোশাবকের পা-চারখানি দুহাতে ধরে ভক্তটি নিজের বুকের ওপর চেপে রেখেছে। তার চোখে-মুখে পরম তৃপ্তির হাসি।

মূর্তিটি অক্ষত নয়। তার চিবুক, কব্জি পর্যন্ত দুখানি হাত ও একপায়ের সামনের অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাহলেও আড়াই হাজার বছর আগের তৈরি মূর্তিটির গঠননৈপুণ্য দেখে সেই নাম-না-জানা ভাস্করের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছে।

সবশুদ্ধ ন'টি গ্যালারী ও একটি ভেস্টিবিউল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই ভেস্টিবিউল। এখানেই রয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের কয়েকটি ভাস্কর্য। প্রখ্যাত প্রাচীন ভাস্কর ফেইদিউস-এর Pheidius) শিষ্য আলকামেনসে-এর (Alkamenses) সৃষ্টি বলে অনুমান করা হয়। পৌরাণিক রাজকন্যা থ্রেস (Thrace) এবং প্রোক্নে-র (Prokne) মূর্তি রয়েছে এখানে। কথিত আছে অবিশ্বাসী স্বামীকে জব্দ করার জন্য উত্তেজনার বশে প্রোক্নে তাঁর একমাত্র ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। মায়ের মূর্তির দুটি হাত ও মুখের বাঁদিকটা ভেঙে গিয়েছে। এটি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪০ অব্দের মূর্তি।

বলা বাহুল্য মিউজিয়ামের অধিকাংশ মূর্তির কথা এরই মধ্যে আমি প্রায় ভুলতে বসেছি। কারণ আমি শিল্পী নই। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। তাহলেও কয়েকটি মূর্তির কথা বেশ মনে আছে। কারণ সেগুলি ভাল লেগেছে আমার। তাদের স্মরণ করে চলি।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নির্মিত জনৈক গর্গন ভগিনীর আবক্ষ মূর্তিটি

সত্যাই অবিস্মরণীয়। ভয়ঙ্করী মূর্তি। গোল মুখমণ্ডল, প্রকাণ্ড মুখগহ্বর, চ্যাপ্টা নাক, চোখে হিংস্র দৃষ্টি, জিভ বেরিয়ে রয়েছে। এটি দেবী এথেনার প্রাচীন মন্দিরে পাওয়া গিয়েছে।

আরও একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন চোখে ভাসছে। একটা সিংহী গরু মেরে খাচ্ছে। গরুটাকে বুকের নিচে ফেলে কামড়ে ধরে আছে। হিংস্র ও তৃপ্ত ভাবটি মুখে প্রতিফলিত। নিখুত ভাস্কর্য। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ সালের মূর্তি।

কয়েকটি স্ফিংস (Sphinx) মূর্তি রয়েছে। সবগুলিই মার্বেল পাথরের। স্ফিংস হল গ্রীক পুরাণের দানবী। তাদের মাথা মেয়েদের কিন্তু দেহ সিংহীর। তারা দুর্গম ও জনবিরল পথের পাশে বসে থাকত। পথিক পেলে তাদের কাছে ধাঁধার উত্তর জানতে চাইত। যে পথিক সঠিক উত্তর দিতে পারত না, তাকে হত্যা করত।

দুটি স্ফিংস মূর্তি আমার ভারী ভাল লেগেছে। মূর্তি দুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ ও ৫৪০ অব্দে নির্মিত। প্রথম মূর্তিটি মোটামুটি অক্ষত কিন্তু দ্বিতীয়টির নিম্নাংশ ভেঙে গিয়েছে। স্ফিংস সম্পর্কে গ্রাকপুরাণে যত ভীতিই প্রদর্শন করা হোক, এই মূর্তি দুটির মুখমণ্ডল যেমন মায়াময় তেমনি সুন্দর। মাথায় চমৎকার চুল, চওড়া কপাল, বড় বড় চোখ, উঁচু নাক আর ঠোটে হাসি। ভেবে অবাক হতে হয় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার সেই মানুষগুলি কি অসাধারণ ধৈর্য অধ্যবসায় আর সৌন্দর্যবোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭০ সালের চারটি ঘোড়াও ভারী ভাল লেগেছে আমার। এগুলি মর্মরমূর্তি। গাইড বলেছেন—'Marble Quadriga'

মূর্তিগুলির পায়ের দিকটা ছোট কিন্তু মাথা সহ ওপরের অংশটি স্বাভাবিক। দুটি ঘোড়ার মুখ ক্ষত-বিক্ষত আর চারটিরই পা ভাঙা। তাহলেও বেশ কয়েক মিনিট আমাকে ওদের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

অ্যাক্রোপলিস মিউজিয়ামে অনেকগুলি নারীমূর্তি রয়েছে। দেবীমূর্তিই বেশি। কোনটি পূর্ণ, কোনটি বা আবক্ষমূর্তি। খ্রীস্টপূর্ব

ষষ্ঠ শতক থেকে পরবর্তীকালে নির্মিত। সবই মর্মরমূর্তি। অপরূপ মুখমণ্ডল ও দেহের গঠন। চমৎকার চুল। পোশাক আর অলঙ্কারের বাহার দেখে বিস্মিত হতে হয়। একটির জামার রঙ নীল, আজও অবিকৃত। আর পরনের পোশাকে পাড় আছে। দেখে মনে হচ্ছে ঢাকাই শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের আরেকটি নারীমূর্তিও ভাল লেগেছে আমার। মূর্তিটি অবশ্য অক্ষত নয়। হাত দুখানিই ভাঙা। চোখ চিবুক ও নাকে ক্ষতচিহ্ন। তাহলেও মুখখানি ভারী সুন্দর। মেয়েটি হাসছে। কিন্তু সে হাসি শুধু লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে। মুখের আর কোথাও হাসির রেখা নেই। তবু হাসিটি বড়ই মধুর। সত্যি বলতে কি মূর্তিটি দেখে তো আমার মোনালিসা-র কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

দেবী এথেনার বেশ কয়েকটি মূর্তি আছে মিউজিয়ামে। তাঁদের মধ্যে দুটিকে বড়ই ভাল লেগেছে। প্রথমটি খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে নির্মিত। শ্বেতপাথরের সুবিশাল দণ্ডায়মানা বিগ্রহ। বলা বাহুল্য অক্ষত নয়। হাত সহ ডানদিকের অনেকখানি অংশ ভেঙে গিয়েছে। তাহলেও মূর্তিটির অপার্থিব সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। যেন নিচের দিকে তাকিয়ে পথ চলেছেন। গম্ভীর মুখে স্বর্গের দীপ্তি। বোধকরি কোন গভীর সঙ্কট থেকে এথেন্সবাসীদের রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে নিমগ্ন রয়েছেন এথেন্সের ইষ্টদেবী।

দ্বিতীয় মূর্তিটিও শ্বেতপাথরের দণ্ডায়মানা দীর্ঘদেহী বিগ্রহ। তিনিও চিন্তাযুক্তা। কিন্তু গায়ে বাহারী পোশাক। হাতে বল্লম। বাঁহাত কোমরে দিয়ে, ডানহাতে বল্লম মাটিতে রেখে তাতে মাথা ঠেকিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছেন। উজ্জ্বল চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। বোধকরি তাঁর প্রিয় এথেনীয়দের কথাই ভাবছেন। মূর্তিটি মোটামুটি অক্ষত। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে নির্মিত।

এই মূর্তিদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে দেবী দুর্গার কথা মনে পড়ে গিয়েছে আমার। মনে পড়েছে কয়েকদিন আগে বার্লিনের এক

মিউজিয়ামে দেখা দেবী এথেনার আরেকটি মূর্তির কথা। সেই সিংবাহিনী রণরঙ্গিনী এথেনার সঙ্গে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করেছি। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত সেই এথেনাও অসুরদের সঙ্গেই সংগ্রামরতা। অর্থাৎ গ্রীসের এথেনাদেবীও আমাদের ভগবতীর মতই অসুরবিনাশিনী! বহুদূরে অবস্থিত দুটি দেশের মাঝে কি বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক সমন্বয়!

বেশ কয়েকটি পুরুষমূর্তি রয়েছে মিউজিয়ামে। দেবতা দানব ও মানুষের মূর্তি। কোনটি পূর্ণ কোনটি আবক্ষ। কোনটিই অক্ষত নয়। তবু অপূর্ব। প্রায় প্রত্যেকটিতে সৌন্দর্য ও শক্তি বিকশিত। অধিকাংশই মর্মর মূর্তি এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে নির্মিত।

পার্থেনন মন্দিরের দেওয়াল থেকে কিছু ছোট ও বড় মূর্তি বা ফ্রিজ এনে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে যেমন দেব-দেবী ও নরনারী আছে, তেমনি রয়েছে পশু-পাখির মূর্তি। পশুর মধ্যে ঘোড়ার সংখ্যাই বেশি। খুবই স্বাভাবিক। সেকালে যে ঘোড়া ছাড়া মানুষ অচল···

কিন্তু আর যে অ্যাক্রোপলিস মিউজিয়ামের কথা ভাবার সময় নেই। হোটেলের সামনে বাস থেমেছে। চন্দ্র ও সুপিনের সঙ্গে উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে চলি দরজার কাছে। আর তখুনি নজর পড়ে থালাখানির দিকে। না থালা নয়, প্লাস্টিকের প্লেট। নিজের সিটের ওপরে রেখে গাইড পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। য়ুরোপে এসে যেখানেই কণ্ডাক্টেড বাসট্যুর করেছি, সেখানেই এই 'টিপস' বা বখশিশ দেবার নিয়ম দেখেছি—জুরিখ লণ্ডন পারি বার্লিন রোম সর্বত্র। সুতরাং বিন্দুমাত্র বিস্মিত না হয়ে দশটি দ্রাশমাস সেই থালার ওপরে রেখে বাস থেকে নেমে আসি। চন্দ্রও তাই করে। এবং ড্রাইভার ও গাইড দুজনেই আমাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানান।

বাস থেকে নেমেই সুপিন বলে—আঙ্কল, বেলা দেড়টা। এসো আমরা একেবারে লাঞ্চ সেরে ঘরে যাই।

—কথাটা মন্দ বলো নি। সত্যি বেশ খিদে পেয়েছে। কিন্তু মুখ-হাত না ধুয়ে···

—সে ব্যবস্থা তো ডাইনিং-হলে রয়েছে।

অতএব তাই করা গেল। হাত-মুখ ধুয়ে লাঞ্চ, সেরে নিলাম। আমি কালকের মতই ভাত ভেজিটেবল ও ডিম সহযোগে নিরামিষ খাবার খেলাম। আর ওরা স্যুপ রুটি মাংস ও পুডিং।

খেয়ে নিয়ে ঘরে আসি। ওরা আমাকে দরজা অবধি পৌঁছে দেয়। বিদায় নেবার সময় সুপিন বলে—আঙ্কল, আমরা ঠিক চারটেয় তোমার কাছে আসছি। একসঙ্গে চা খেতে খেতে কালকের প্রোগ্র্যাম ঠিক করব। তারপরে 'Mighty Hero of the Olden times'-এর গল্প শুনব।

প্রথমে কথাটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তারপরেই মনে পড়েছে কুপারসাহেব তাঁর 'লিজেণ্ডস অব্ গ্রীস এ্যাণ্ড রোম' বইতে এনামেই 'হারকিউলিস'-কে পরিচিত করিয়েছেন।

একটু হেসে বলেছি—তুমি তো তাঁর গল্প জানো, তবু কেন আবার শুনতে চাইছ?

—প্রথমত কুপার সাহেব বড়ই সংক্ষেপ করেছেন। আর দ্বিতীয়ত আমার আঙ্কল ভারী সুন্দর গল্প বলে।

কি আর বলব এ মেয়েকে। হাসতে হাসতেই জবাব দিয়েছি—বেশ তবে তাই হবে।

—মাই ভেরী ভেরী সুইট আঙ্কল।

ঘরে এসে পোশাক পালটে আরেকবার হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিই। সকাল থেকে বেশ ধকল গেছে। তাহলেও কিন্তু ক্লান্ত বোধ করছি না। প্রথম কারণ বাইরে বেশ গরম হলেও এখানে একদম ঘাম হয় না। দ্বিতীয় কারণ আমার হৃদয় ও মন এখনও আনন্দে অভিভূত হয়ে আছে। আমি যে পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম মহানগরী এথেন্সে এসেছি, আজ অ্যাক্রোপলিস দর্শন করেছি।

ঘুম কিন্তু আসছে না চোখে। এমনিতেই দুপুরে আমি ঘুমোতে পারি না। তাছাড়া গ্রীস বুঝিবা আমার চোখের ঘুম নিয়েছে কেড়ে। আমি শুয়ে শুয়ে তারই কথা ভেবে চলেছি।

কেবল প্রতীচ্য আর মধ্য-প্রাচ্য নয়, সারা সভ্য পৃথিবীতেই গ্রীসের প্রভাব অপরিমেয়। প্রাচীন গ্রীসের মানুষ মানব সভ্যতার উষালগ্নে শিল্প স্থাপত্য জ্যোর্তিবিজ্ঞান অঙ্ক দর্শন ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার ও অনুধ্যানের কথা বলে গিয়েছেন, তা আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি রাষ্ট্রনীতি ও আইন-কানুন মোটামুটি ভাবে গ্রীসের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। গ্রীক সাহিত্য পুরুষানুক্রমে পাশ্চাত্যের কবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা দান করে চলেছে। ভাষা ও গণতন্ত্র এমন কি খেলাধূলার ক্ষেত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি দেশ গ্রীসের কাছে সমান ঋণী রয়ে গিয়েছে। এবং বলাবাহুল্য পাশ্চাত্যের প্রভাবে গ্রীসের জ্ঞানভাণ্ডার পরবর্তীকালে প্রাচ্যজগতেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ক্লডিয়াস টলেমি-র (Claudius Ptolemaeus) কথা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত তাঁর 'গাইড টু জিওগ্রাফী' (Geographika Huphegesis) বইতে আমরা তৎকালীন নিম্নগঙ্গার যে বিবরণ পাই, তা অতিশয় প্রামাণ্য রূপে আজও সমান আদৃত।

অথচ গ্রীস একটি ক্ষুদ্র দেশ। আমাদের দেশের কথা বাদই দিলাম। বর্তমান গ্রীসের আয়তন গ্রেট বৃটেনের মাত্র অর্ধেক। এই আয়তনের একটা বড় অংশ আবার দ্বীপ। শতাধিক দ্বীপ সহ মূল-ভূখণ্ড নিয়ে গ্রীসের বর্তমান আয়তন মাত্র ৫০,০০০ বর্গমাইল। আর মূল-ভূখণ্ড মানে উপদ্বীপ। স্বাভাবিক ভাবেই এদেশের উপকূল-রেখা সুদীর্ঘ। এবং দেশের যেকোন শহর কিম্বা গ্রাম থেকে রেল অথবা মোটরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাগর সৈকতে পৌঁছন যায়।

প্রাচীন নিদর্শনের পরেই গ্রীসে পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ সমুদ্র ও পাহাড়। পাহাড়গুলো খুব একটা উঁচু নয়। সর্বোচ্চ শিখর অলিম্পাস পর্বতের উচ্চতাও দশ হাজার ফুটের চেয়ে কম। তাহলেও

গ্রীসের যেকোন জায়গা থেকেই পাহাড় দেখা যায়।

সেকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক এথেন্স একালে একটি আধুনিক মহানগরী। প্রশস্ত ও মসৃণ পথ, নতুন ডিজাইনের বড়-বড় বাড়ি, আলোঝলমল সুসজ্জিত দোকান ও বাজার, অসংখ্য রেস্তরাঁ আর বহু পাঁচতারা হোটেল নিয়ে রাজধানী এথেন্স। ছবির মতো সুন্দর ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শহর। গতকাল আমার হোটেলের রুফ-গার্ডেন থেকে এবং আজ অ্যাক্রোপলিসে দাঁড়িয়ে তাকে আমি দেখেছি। আমার দু-চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে।

পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত মহানগরীর উচু-নিচু সব বাড়ির ওপরেই লাল টালির ছাউনী। দূর থেকে বাড়িগুলোকে কয়েকটি লাল হলরেখার মতো মনে হয়। এথেন্স আর তার বন্দরনগরী পাইরিউস-এর (Piraeus) মিলিত জনসংখ্যা প্রায় পনেরো লক্ষের মতো।

গ্রীসদেশের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জমি চাষ যোগ্য। বাকি চার ভাগ জুড়েই জঙ্গল পাহাড় আর, পতিত জমি। তাহলেও গ্রীসকে বলা হয় 'Peasant Country' মানে চাষীর দেশ।

এদেশে কিন্তু ভূমিহীন কৃষক নেই। প্রত্যেক কৃষকের নিজস্ব জমি ও গরু-গাধা-ঘোড়া আছে। আছে কিছু অলিভ গাছ আর একটুকরো আঙ্গুর ক্ষেত। গ্রীসে বেশ ভাল তামাক হয়।

গ্রীসের পাহাড় এবং পাহাড়তলি পাইন ও সাইপ্রেস প্রভৃতি গাছে ছাওয়া। গ্রীস কাষ্ঠসম্পদে সমৃদ্ধ। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এদেশে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে গ্রীস যন্ত্রশিল্পে যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। তবে এঁদের তেল ও কয়লা আমদানী করতে হয়।

কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও গ্রীস পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। গ্রীসের দ্বীপগুলি পর্যটকদের কাছে পরম-রমণীয়। মূল-ভূখণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হল মধ্যাঞ্চল। এই অঞ্চলে যেমন মহানগরী এথেন্স, তেমনি প্রাচীনতম অলিভ বাগান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গুর ক্ষেত। তাই আমার

মতো সব পর্যটকই এথেন্সকে কেন্দ্র করে গ্রীস ভ্রমণ করেন।

গ্রীকপুরাণের গল্প পড়ে আমি ভাবতাম গ্রীকবাসীরা সবাই দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর। এঁরা দেখতে সুশ্রী। চোখের তারা এবং চুল কালো। স্বাস্থ্যও মন্দ নয়। কিন্তু দীর্ঘদেহী নয় খুব একটা। এঁরা কল্পনাপ্রবণ ও উদ্ভাবনীমন সম্পন্ন। কথা বলতে বড়ই ভালোবাসেন। রাজনীতি এঁদের আলাপ-আলোচনার প্রিয়তম বিষয়।

এঁদের পূর্বপুরুষগণ প্রায় তিন হাজার বছর আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং আজও এঁরা গণতন্ত্রের পূজারী। বিস্ময়ের কথা দুই দফায় প্রায় দেড় হাজার বছর রোম ও তুরস্কের শাসনে থাকার পরেও কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের মমত্ব বিন্দুমাত্র কমে নি। ১৮২৭ সালে গ্রীস তুর্কী কবলমুক্ত হয়। কিন্তু দেশে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পঁচাশি বছর লেগে যায়। ১৯১২ সালে গ্রীস স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়কালের মধ্যে গ্রীস অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে।

কিন্তু রাজনীতির কথা থাক। আমি একজন সাধারণ পর্যটক। আমার এসব ভাবনার কি দরকার। আমি বরং মানুষ গ্রীসবাসীদের কথা ভাবি। গ্রীকরা অতিশয় অতিথি পরায়ণ। তাঁরা জানেন যে পর্যটন ব্যবসায় তাঁদের দেশের ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু পর্যটকদের অতিথি জ্ঞানে সেবা ও সাহায্য না করলে পর্যটনের প্রসার সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে জনৈক প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিকের বইতে পড়া দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘটনা দুটি এই রকম:

একদিন একজন বিদেশী পর্যটক পাহাড়ী পথে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেন। দৈবক্রমে তাঁর সঙ্গে একজন চাষীর দেখা হয়ে গেল। ভাষা না জেনেও পর্যটক তাঁকে নিজের বিপদের কথা বোঝাতে সমর্থ হলেন। চাষী তখন চাষ ফেলে সেই বিদেশী অতিথির সঙ্গে বেশ খানিকটা পথ চলে তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন। অবশেষে কৃতজ্ঞ পর্যটক তাঁকে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন। চাষী সবিনয়ে সে

বখশিস প্রত্যাখ্যান করে পর্যটককে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁর কর্ত্তব্য পালন করেছেন, অতএব অর্থ নেবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

আরেকজন ইংরেজ অধ্যাপক ঘুরতে ঘুরতে একদিন সন্ধ্যায় গ্রীসের এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হলেন। কোন বিশ্রাম ভবন কিম্বা হোটেল না পেয়ে তিনি অবশেষে এক চাষীর বাড়িতে গিয়ে রাতের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। দরিদ্র চাষী সস্ত্রীক সানন্দে স্বাগত জানালেন সেই বিদেশী অতিথিকে। নিজেরা না খেয়ে তাঁদের খাবার খেতে দিলেন অধ্যাপককে। এবং তাঁকে নিজেদের বিছানায় শুতে অনুরোধ করলেন। ক্লান্ত অধ্যাপক ঘুমিয়ে পড়লেন।

চাষী দম্পতি সেই শীতের রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু দ্রাশমাস ধার করে নিয়ে এলেন।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পরে অধ্যাপক যখন তাঁদের কাছে বিদায় চাইলেন, তখন দরিদ্র চাষী সেই টাকাক'টি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—আমাদের সামান্য উপহার। ভরসা করি পথে আপনার কাজে আসবে।

অভিভূত অধ্যাপক নিজের টাকা-কড়ি বের করে তাঁদের দেখিয়ে অনেক কষ্টে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে তাঁর জামা-প্যাণ্ট নোংরা এবং পিঠের থলিটি জরাজীর্ণ হলেও তিনি কপর্দকশূন্য নন।

যাক্ গে, এবারে অন্য কথা ভাবা যাক। গ্রীকরা ব্যবসায়ী জাতি। কিন্তু তাঁরা অতিশয় সৎ। এঁরা নিজের গ্রামকে বড়ই ভালোবাসেন। তাই ধনলাভ করলেই নিজের গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। কেউ স্কুল-কলেজ, কেউ পাঠাগার, কেউ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা কিম্বা অন্য কোন জনহিতকর কাজ করে থাকেন।

গ্রীকজীবনে-ধর্মের প্রভাব প্রচুর। আগে তাঁরা প্রকৃতির উপাসনা করতেন। তারপরে লৌকিক দেব-দেবীর পূজা শুরু করেন। রোমান আমলে গ্রীকরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এখন এদেশের অধিকাংশ মানুষই 'চার্চ অব্ ইংলণ্ড'-এর সঙ্গে যুক্ত 'অর্থোডক্স' গীর্জার (Greek Orthodox Church) শিষ্য। এই অর্থোডক্স গীর্জাই তুর্কীদের

বিরুদ্ধে গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গ্রীকরা তাঁদের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের জন্য গর্বিত। কিন্তু তাঁরা অতীত রোমন্থন করে বর্তমানকে বিস্মৃত হন না। তুর্কী কবল-মুক্ত হবার পর থেকে তাঁরা শিক্ষার দিকে নজর দিয়েছেন। যেকোন গ্রীক গ্রামে গেলে দেখা যাবে যে সবচেয়ে ভাল বাড়িটি স্কুল কিম্বা কলেজ। পড়াশুনার সঙ্গে গ্রীক ছেলে-মেয়েরা শরীর চর্চার দিকেও যথেষ্ট যত্ন নেয়।

বার বার বিদেশীর পদানত হয়েও গ্রীসের মানুষ নিজেদের ভাষাকে অবহেলা করেন নি। রোমান আমলে গ্রীকরা নিজেদের ভাষাতেই 'নিউ টেস্টামেণ্ট' রচনা করেন। আর তা থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় নিউ টেস্টানেণ্ট অনূদিত হয়েছে। লাতিনের মতো গ্রীসভাষা মরে যায় নি, আজও বেঁচে রয়েছে।

গ্রীসের কুটিরশিল্প সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক। এদেশে নাচ গান ও বাজনা য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পথিকৃৎ।

গ্রীকদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাওয়া-দাওয়া বেশ সহজ ও সরল। এঁদের আমিষ ও নিরামিষ দু'রকম রান্নাই বেশ সুস্বাদু। এঁরা খুবই কফি পান করেন।

গ্রীকরা এখনও তাঁদের 'ট্রাডিশনাল লোকাল ক্লথ' অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিক দিশী পোশাক পছন্দ করেন। কিছুকাল আগেও গ্রীক ছেলে-মেয়েরা লম্বা চুল রাখতেন কিন্তু এখন ছেলেরা চুল ছাটেন।

এখনও গ্রীসের গ্রামে-গ্রামে লৌকিক নাচ-গান ও বাজনা বিশেষ জনপ্রিয়। মহাকবি হোমারের 'ইলিয়দ অ্যাণ্ড ওদিসি' এখনও সমান প্রিয়। তাই বলে এদেশে আধুনিক গান-বাজনা কিম্বা পপ-সঙ-এর কোন কদর নেই। সেকথা মনে করার কোন কারণ নেই। গ্রীসের মানুষ সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গান-বাজনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মহামিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

সাত

'Hercules was, in fact, the strongest man whom the world has any record. Nowadays, when we wish to say that anyone is very, very powerful, we call his strength Herculean.'

—আমি পড়েছি। 'লিজেণ্ডস অব্ গ্রীস এ্যাণ্ড্ রোম' বইতে। কিন্তু তখুনি বলেছি কুপারসাহেব বড় সংক্ষেপ করেছেন। তোমাকে বড় করে বলতে হবে।

আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে চন্দ্র বলে—এখন বুঝুন ঠেলা!

সেকথার উত্তর না দিয়ে একটু হেসে সুপিনকে বলি—বেশ! তাই বলব। কিন্তু অতকথা তোমার ভাল লাগবে কি?

—লাগবে, লাগবে, লাগবে! তুমি শুরু করো দেখি!

আমি কোন কথা না বলে একবার এথেন্সকে দেখে নিই। আমরা তিনজন হোটেলের রুফ-গার্ডেনে বসে আছি। আকাশে ও মাটিতে গোধূলি ঘনিয়ে আসছে। আধো-আলো আধো-ছায়ায় এথেন্সকে ভারী ভাল লাগছে।

ক্রমশ তার বুক জুড়ে আলো জ্বলে উঠছে। খানিকক্ষণ বাদেই সে আলোর মালা গলায় দিয়ে আমাকে হাতছানি দেবে।...

কিন্তু আর চুপ করে থাকলে আবার মেয়ের তাগিদ শুনতে হবে। সুতরাং শুরু করি—

তোমরা জানো জুপিটার দেবতাদের রাজা হলেও মর্তের মেয়েদের প্রতি তাঁর একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। এইভাবে রাজকন্যা ড্যানীর গর্ভে তাঁর পুত্র পার্সিউস জন্মগ্রহণ করেন।

ওরা মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—

আর তাই দেবসম্রাজ্ঞী জুনোর অশান্তির শেষ নেই। তিনি

স্বামীকে শোধরাতে পারেন না। ফলে তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ে সেই নিরাপরাধ মর্তমানবী আর তাঁদের সন্তানদের ওপরে।

সে যাই হোক দেবরাজ জুপিটার এবারে শেষবারেব মতো একজন মর্তমানবীকে ভোগ করতে চাইলেন, কারণ তিনি এমন সন্তানকে জন্ম দিতে চান, যিনি মানুষ হয়েও শৌর্য বীর্য ও ক্ষমায় হবেন দেবতাদের চেয়ে মহত্তর। সংসারের সকল দুঃখকে জয় করে যিনি হবেন মৃত্যুঞ্জয়, হবেন নীলকণ্ঠ।

কিন্তু কে সেই মহামানবকে গর্ভে ধারণ করবেন? অনেক ভাবনা চিন্তার পরে জুপিটারের মনে পড়ল ট্রোয়েজেনরাজ অ্যাম্ফিট্রিয়নের রাণী আল্কমিনার কথা। তিনি শুধু সুন্দরী নন, অসাধারণ বুদ্ধিমতী।

সুযোগও এসে গেল। অ্যাম্ফিট্রিয়নকে হঠাৎ যুদ্ধে চলে যেতে হল। তাঁরই চেহারা নিয়ে জুপিটার গেলেন রাজপ্রাসাদে। বিস্মিতা আল্কমিনাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—তোমার বিরহ সইতে না পেরে সেনাপতির কাছ থেকে তিন দিন ছুটি নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

আল্কমিনাকে তিনদিন ভোগ করে দেবরাজ ফিরে গেলেন অলিম্পাসে। কিছুদিন বাদে অ্যাম্ফিট্রিয়ন ঘরে ফিরলেন। জুপিটারের ছল বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাঁর আর করার কিছুই ছিল না। কারণ আল্কমিনার গর্ভে তখন দেবরাজের সন্তান।

সেই সন্তানই মহত্তম মহাবীর হারকিউলিস। জুপিটার ডাকতেন হেরাক্লেস। মানে হেরা বা জুনোদেবীর জয়। অথচ এই জুনোর জন্যই হেরাক্লেসকে সারাজীবন দুঃসহ দুঃখ সইতে হয়েছে।

হারকিউলিসের বয়স যখন কয়েকদিন, তখুনি জুনো তাঁকে হত্যা করতে দুটি বিষধর সাপ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শিশুকৃষ্ণ যেমন পূতনাবধ করেছিলেন, তেমনি শিশু হারকিউলিসও দুহাতে গলা টিপে সাপ দুটিকে হত্যা করলেন। আর তাই শুনে থীব্‌স-এর অন্ধ ভবিষ্যৎবক্তা টাইরেসিয়াস আল্কমিনাকে বললেন, হাজার হাজার বছর পরেও মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে তোমার এই বীরপুত্রের

কাহিনী শোনাবে।

কথাটা শুনে অ্যাম্ফিট্রিয়ন আর হারকিউলিসকে অবহেলা করতে পারলেন না। তাঁকে পরমস্নেহে মানুষ করতে থাকলেন। যথাসময়ে তিনি ছেলের সব রকম সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না বালকের। গান-বাজনাও মোটেই পছন্দ করতেন না। একদিন তাঁর সঙ্গীত শিক্ষক গালমন্দ করায় তিনি হাতের বীণাটি শিক্ষকের মাথায় ছুড়ে মারলেন। আর তারই ফলে মাষ্টারমশাই মরে গেলেন।

হারকিউলিসের অসাধারণ উৎসাহ ছিল যুদ্ধবিদ্যায়। স্বয়ং জুপিটার তাঁকে সারথ্য শেখালেন। সেনাপতি ক্যাস্টর শেখালেন রাজনীতি ও সৈন্য পরিচালনা। মার্কারীদেবের এক ছেলে তাঁকে মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ শেখালেন। স্বয়ং অ্যাপোলোদেবের কাছ থেকে তিনি ধনুর্বিদ্যা লাভ করলেন। বর্শায়ও অব্যর্থ লক্ষ্য হল তাঁর। আর এইসব আয়ত্ত করতে গিয়ে তিনি অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী হলেন। তবে তিনি খেতেও পারতেন প্রচুর। অথচ মানুষটা কিন্তু চিন্তাশীল ও প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। দিনের শেষে কোন নির্জন স্থানে খোলা আকাশের নিচে একা-একা বসে আপন ভাবনায় বিভোর হতে বড় ভালোবাসতেন।

আঠারো বছর বয়সে হারকিউলিসের শিক্ষা শেষ হল। তারপরেই তিনি শুনতে পেলেন সিথেরন পর্বতের পাদদেশে একটা প্রকাণ্ড মানুষখেকো সিংহ বড়ই অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। একদিন তিনি সেই বনে প্রবেশ করলেন। তারপরে একটা অলিভগাছের গুঁড়ি উপড়ে হাতে নিলেন। সিংহটা সামনে আসতেই সেই গুড়ির আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। তারপরে রওনা হলেন থিব্‌স নগরে।

কিছুকাল আগে থিব্‌সবাসীরা মিনিয়ানদের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। তাই বিশ বছর ধরে থিবসের রাজা ক্রিয়ন মিনিয়ানদের রাজস্ব দিয়ে আসছিলেন। মিনিয়ান রাজার দূত প্রতিবছর ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে থিব্‌স আসতেন, সেই রাজস্ব নিয়ে যেতেন।

পথে তাদের সঙ্গে দেখা হল হারকিউলিসের। তিনি থিব্‌স যাচ্ছেন বলায় অকারণে রাজদূত তাঁকে অপমান করলেন। ক্রুদ্ধ হারকিউলিস রাজদূতের নাক ও কান কেটে দিলেন। তাঁর সঙ্গীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

থিব্‌স এসে হারকিউলিস রাজা ক্রিয়নকে বললেন সব কথা। ক্রিয়ন আঁতকে উঠলেন। হারকিউলিস তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আপনি সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলুন। আমি তাদের নেতৃত্ব দেব। আপনাকে এই অপমানের হাত থেকে মুক্ত করব।

তাই করলেন হারকিউলিস। দূতের কাছে সব কথা শুনে মিনিয়ানরাজ থিব্‌স আক্রমণ করলেন। হারকিউলিস তাঁকে সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন। থিব্‌স তার হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেলো। কৃতজ্ঞ ক্রিয়ন তাঁর বড় মেয়ে মিগারাকে হারকিউলিসের হাতে সমর্পণ করলেন। রাজার জামাই হয়ে হারকিউলিস থিব্‌স নগরে সুখে সংসার করতে থাকলেন।

কিন্তু জুনো তাঁর সুখ বেশিদিন সইতে পারলেন না। তাঁর সুখের সংসার দেখে তিনি ঈর্ষায় জ্বলতে থাকলেন। অবশেষে তিনি একদিন মায়াবলে হারকিউলিসকে পাগল করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনুষ্যত্ব গেল হারিয়ে, তাঁর মধ্যে জেগে উঠল একটা নিষ্ঠুর পাশবিকতা। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের শত্রু ভাবলেন। একে একে হত্যা করলেন তাঁদের।

—সেকি! নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করলেন! প্রায় চিৎকার করে উঠল সুপিন।

হোটেলের রুফ-গার্ডেনে বসে সুপিন ও চন্দ্রর কাছে হারকিউলিসের গল্প বলছি। গল্পটা সুপিনেরও অজানা নয়। তবে সে শুধু জানে হারকিউলিস কোন পাপ করেছিলেন। আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাকে বারোটি কঠিন কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই পাপটা যে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করা, একথা জানা ছিল না তার। তাই সে অমন চিৎকার করে উঠেছে।

—হ্যাঁ। তাই করেছেন হারকিউলিস। আর তারপরেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে। অনুতপ্ত হারকিউলিস আত্মহত্যা করতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁর দেখা হয়ে গেল বন্ধু থেসিউসের সঙ্গে। তিনি হারকিউলিসকে আত্মহত্যা করতে দিলেন না, তাঁকে এথেন্স নিয়ে এলেন। তবু শান্তি এলো না তাঁর মনে। অবশেষে এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, তা জানার জন্য তিনি ডেল্‌ফির মন্দিরে গেলেন। সেখান থেকে ভবিষ্যৎবাণী পেলেন—তোমাকে থিব্‌স ছেড়ে মাইকেনি নগরে চলে যেতে হবে। সেখানে রাজা ইউরিস্থিউসের অধীনে বারো বছর দাসত্ব করতে হবে। রাজার সব আদেশ নীরবে পালন করতে পারলেই প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে তোমার।

সে আদেশ শিরোধার্য করলেন হারকিউলিস। তিনি মাইকেনি এসে রাজা ইউরিস্থিউসকে অভিবাদন করলেন। তাঁর বলদীপ্ত চেহারা দেখে ভয় পেলেন ইউরিস্থিউস। কিন্তু লোকটা ভীতু হলেও বোকা ছিলেন না। বিশেষ করে তার আগেই জুনো এসে তাঁকে সব বলে গিয়েছেন।

তাই তিনি মনের ভয় মনে চেপে রেখে গম্ভীর স্বরে বললেন—তোমাকে বারোটি কর্তব্য পালন করতে হবে। তাহলেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে।

—বেশ বলুন। কি করতে হবে আমাকে ? সবিনয়ে হারকিউলিস প্রশ্ন করলেন।

—প্রথম তোমাকে নিমিয়ার সিংহকে বধ করতে হবে।

রাজাকে কুর্নিশ করে হারকিউলিস নীরবে বেরিয়ে গেলেন রাজসভা থেকে।

নিমিয়ার সিংহ বাস করত ট্রিটাস পর্বতের একটা গুহায়। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হারকিউলিস সেই গুহার সামনে গিয়ে সিংহের মুখোমুখি হলেন। তিনি তাকে তীর মারলেন, তরোয়াল দিয়ে আঘাত করলেন, তার কিছুই হল না। কারণ তার শরীর ছিল বজ্রের মতো কঠিন। অবশেষে হারকিউলিস তার গদা দিয়ে সিংহের মাথায় আঘাত

করলেন। সিংহ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। হারকিউলিস গলা টিপে মেরে ফেললেন তাকে। তারপরে তার সেই বিশাল দেহটা কাধে নিয়ে মাইকেনিতে ফিরে এলেন।

রাজা আরও ভয় পেয়ে গেলেন। তবু হারকিউলিসকে আদেশ করলেন—লার্নার জলাভূমিতে হাইড্রা নামে ভয়ঙ্কর একটা সাপ বাস করে। তার ন'টি ফণাই অমর। সে দেবসম্রাজ্ঞীর প্রিয়। তবু তাকে বধ করতে হবে।

বন্ধু ইওলাসকে সঙ্গে নিয়ে হারকিউলিস লার্নার জলাভূমিতে পৌঁছলেন। দেখতে পেয়েই হাইড্রা তাঁদের আক্রমণ করল। হারকিউলিস গদার আঘাতে তার একটা ফণা থেতলে দিয়ে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দুটি ফণা গজিয়ে উঠল এবং তার শক্তি আরও বেড়ে গেল।

হারকিউলিস তখন ইওলাসকে বললেন, গাছের শুকনো ডালে আগুন লাগিয়ে নাও। আমি এক-একটা ফণা কাটব আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে কাটা জায়গাটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

এইভাবে হাইড্রাকে হত্যা করে নিজের তীরের ফলাগুলোতে তার ভয়ঙ্কর বিষ মাখিয়ে নিয়ে হারকিউলিস ফিরে এলেন মাইকেনি। রাজাকে হাইড্রা হত্যার সংবাদ দিলেন।

হারকিউলিসের দাসত্বের তৃতীয় শ্রম গভীর অরণ্য থেকে দেবী ডায়নার পরমপ্রিয় একটি হরিণকে ধরে আনা। স্বাভাবিক কারণেই হারকিউলিস হরিণটিকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে চাইলেন না। ফলে তাঁকে এক বছর ধরে বনে বনে সেই হরিণের পেছনে ছুটে বেড়াতে হল। অবশেষে ক্লান্ত হরিণটিকে ধরে ফেললেন তিনি। তাকে কাঁধে নিয়ে মাইকেনি ফিরে চললেন।

বনের মাঝে দেবী ডায়না পথ আগলে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধদেবী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। হারকিউলিস নতজানু হয়ে দেবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বললেন, আমি আপনার হরিণের কোন ক্ষতি করব না। একবার রাজাকে দেখিয়েই ওকে আবার বনে ছেড়ে

দিয়ে যাবো। দয়া করে আমাকে এই অনুমতিটুকু দান করুণ

দেবী বললেন, তথাস্তু।

—একি থামলে কেন?

আমি থামতেই সুপিন বলে ওঠে। আমি কোন উত্তর দেবার আগেই চন্দ্র ধমক দেয়—আহা, আঙ্কলকে একটু হাঁফ ছাড়তে দাও। তুমি বড্ড নাছোরবান্দা!

ওর কথায় বোধ করি একটু লজ্জা পায় সুপিন। বেচারী চুপ করে রয়েছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠি—না, না, গল্প শুনতে ভালোবাসা তো ভাল। আর এতে আমার কোন কষ্টই হচ্ছে না।

—তাহলে বলো।

সুপিনের কথা শুনে আমরা দুজনেই হেসে উঠি। হাসতে হাসতেই বলতে শুরু করি—

হারকিউলিসের চতুর্থ শ্রম ইরিম্যান্থাসের পার্বত্যাঞ্চল থেকে একটা বরাহ ধরে নিয়ে আসা। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রম হল রাজা আগিয়াসের গোশালা পরিস্কার করা এবং স্টিম্ফালিয়ন হ্রদের মাংসভুখ পক্ষীদের হত্যা করা।

সপ্তম শ্রম সম্পাদন করার জন্য তাঁকে যেতে হল ক্রীটদ্বীপে। কারণ সেখানে বৃষরূপী একটা দৈত্য বড় অত্যাচার শুরু করেছিল। ক্রীটের রাজা মাইনস তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু হারকিউলিস সবিনয়ে সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে একাই দৈত্যটাকে সংহার করলেন।

ক্রীট অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে ফিরে আসা মাত্র ইউরিস্থিউস আদেশ দিলেন, এবারে উত্তরে যাও! যুদ্ধদেব মার্সের পুত্র এবং থে্রস দেশের রাজা ডায়োমিডিসের নরমাংসভুখ ঘোড়া চারটিকে ধরে নিয়ে এসো।

তাই গেলেন হারকিউলিস। প্রথমেই ঘোড়া চারটিকে ধরে এনে সাগরতীরে বেঁধে রাখলেন। তারপরে রাজা ডায়োমিডিসকে হত্যা করে সেই ঘোড়াদের তার মাংস খাওয়ালেন। অবশেষে ঘোড়াগুলো নিয়ে এলেন ইউরিস্থিউসের সামনে। রাজা তো তাদের

দেখে ভয়েই অস্থির। কোনমতে বললেন, এগুলোকে অলিম্পাসের পাহাড়গুলিতে ছেড়ে দিয়ে এসো।

হারকিউলিসের নবম শ্রমটির বড়ই ব্যক্তিগত এবং পরিণতিটা করুণ। রাজা আদেশ করেছিলেন, অ্যামাজনদের রাণী হিপোলিটার কোমর থেকে হীরা-মাণিক্যের মেখলাটি খুলে আনতে হবে।

কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে থার্মোডন নদীর অববাহিকায় অ্যামাজন জাতির বাস। রণদেবতা মার্স তাদের আদিপিতা। মাতৃতান্ত্রিক তাদের সমাজ, রাণীরাই দেশের শাসনকর্ত্রী। তাঁদের নাম হিপোলিটা, মিলানিপা আর আন্টিয়োপি। সে দেশের নারীরাই যুদ্ধ করে। তারা খুবই শক্তিশালিনী। একবার তারা ট্রয় নগর আক্রমণ করেছিল।

হারকিউলিস আসছেন, এ খবরটা রাণীরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই থার্মোডন নদীর মোহনায় তাঁর রণতরী নোঙ্গর করছে শুনেই স্বয়ং বড়রাণী হিপোলিটা সেখানে ছুটে এলেন। হারকিউলিসের অপরূপ রূপ ও বলিষ্ঠ দেহশ্রী তাঁকে মুগ্ধ করল। প্রথম দর্শনেই তিনি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। তাঁর পাণিপীড়ন করে পরম সমাদরে প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

হারকিউলিস হিপোলিটার পরিচর্যায় প্রীত হলেন। তিনি দরদী কণ্ঠে রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, সুন্দরী! তুমি কি জানো কেন আমি তোমার কাছে এসেছি।

প্রেমবিহ্বলা হিপোলিটা মাথা নাড়লেন।

হারকিউলিস তাঁর কটিদেশ জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার এই মেখলাটি আমার চাই।

দয়িতের হাতের ওপরে নিজের একখানি হাত রেখে মধুক্ষরা স্বরে দয়িতা জিজ্ঞেস করলেন, শুধু মেখলাটি নিয়ে যাবে? সেই সঙ্গে মেখলার মানুষটিকে সঙ্গে নেবে না?

হারকিউলিস হিপোলিটাকে বুকে টেনে নিলেন। পরম তৃপ্তিতে রাণী সেই প্রশস্ত বুকে মুখ লুকোলেন।

কিন্তু ভাগ্যাহত হারকিউলিস সে সুখ বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলেন না। কারণ ইতিমধ্যে জুনো অ্যামাজন নারীর ছদ্মবেশে রাজধানীর পথে পথে হারকিউলিসের নামে মিথ্যে কুৎসা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বলে বেড়াচ্ছিলেন, গ্রীক হারকিউলিস তোমাদের রাণী হিপোলিটার শ্লীলতা হানি করছে। তোমরা গ্রীক রণতরী আক্রমণ করো, হারকিউলিসকে শাস্তি দাও।

অ্যামাজন নারীবাহিনী তাই করে বসল। তারা গ্রীক রণতরী আক্রমণ করল। আর সেই সংবাদ কানে আসতেই হারকিউলিস ঘৃণাভরে হিপোলিটাকে দূরে ঠেলে দিলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, বিশ্বাসঘাতিনী এই আছে তোর মনে! এবারে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!

মুহূর্তের মধ্যে কোমর থেকে ছোরা বের করে হারকিউলিস হিপোলিটার বুকে বসিয়ে দিলেন। নিরাপরাধিনী রাণীর দেহটি গড়িয়ে পড়ল তাঁর পায়ের ওপরে। মৃত্যুপথযাত্রিণীর কটিদেশ থেকে হারকিউলিস ছিনিয়ে নিলেন মুক্তামেখলা।

প্রাসাদের বাইরে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন নারীবাহিনীর ওপরে। বহু রণনেত্রীকে বধ করে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন হারকিউলিস। তারপরে বন্ধু থেসিউসের সঙ্গে জাহাজে এসে উঠলেন। আসার সময় থেসিউস রাণী আন্টিয়োপিকে বন্দী করে নিয়ে রওনা হলেন দেশে।

—রিয়েলী প্যাথেটিক! করুণ কণ্ঠে সুপিন বলে ওঠে। প্রেমময়ী হিপোলিটার জন্য ওর মন ভারী হয়ে উঠেছে।

না, মেয়েটার বড়ই মায়া-মমতা। কিন্তু ওকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখতে হবে। তাই আবার শুরু করি—

দশম আদেশ পালন করতে হারকিউলিসকে যেতে হল পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে। সেখানে ইরিথিয়া নামে দ্বীপে বাস করতো টাইটান বংশের ভয়ানক দৈত্য গেরিয়ন। তার তিন মাথা ও ছয় হাত। আর আছে একপাল সুন্দরী গাভী। গেরিয়নকে হত্যা করে সেই

গাভীদের নিয়ে আসতে হবে।

এ যাত্রায় অ্যাপোলোদেব সাহায্য করলেন হারকিউলিসকে। তিনি তাঁকে একখানি সোনার নৌকো দিলেন। সেই নৌকোয় চড়ে অত্যন্ত অল্প সময়ে তিনি পৌঁছে গেলেন ইরিথিয়া দ্বীপে।

গেরিয়নের রক্ষক ও তুই মাথাওয়ালা কুকুরগুলোকে বধ করে হারকিউলিস তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বেশ কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ করতে হল তাঁকে। কারণ দৈত্যটার তিনটে মাথা। একটাকে কাহিল করলে বাকি তুটো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

তাহলেও শেষ পর্যন্ত হারকিউলিস তাকে হত্যা করতে সমর্থ হলেন। তারপরে তার সেই গাভীগুলোকে নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

একাদশ আদেশ পালন করতে হারকিউলিসকে আবার যেতে হল পশ্চিমে। সেখানে অ্যাটলাসের বাগানে ছিল জুনোর একটা সোনার আপেল গাছ। সেই গাছ থেকে সোনার আপেল নিয়ে আসতে হল তাঁকে।

—ব্যাস্। এবারে শেষ শ্রম। আর তারপরেই হারকিউলিস মুক্ত হয়ে যাবেন। খুশির স্বরে সুপিন বলে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলতে থাকি—শেষ বলেই ইউরিস্থিউস তাঁকে এবারে একটা খুবই কঠিন কাজ দিলেন।

—কি রকম ?

বললেন, তোমাকে যেতে হবে প্রেতভূমিতে। সেখান থেকে তিন মুখওয়ালা হিংস্র শ্বাপদ সার্বেরাসকে বন্দী করে নিয়ে আসতে হবে।

তাঁর আগে তিনজন মানুষ প্রেতভূমিতে গিয়েছেন, প্রথম অরফিউস তাঁর অকালমৃতা প্রাণপ্রিয়া ইউরিডাস-কে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তাঁর সে যাত্রা বিফল হয়েছে। তবে তিনি নিজে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

অরফিউসের পরে গিয়েছেন থেসিউস ও তাঁর বন্ধু পিরিথৌস। তাঁরা তুজনেই সেখানে বন্দী হয়ে আছেন।

—কেন ?

—কারণ তাঁরা প্রেতরাজ প্লুটোর রাণী প্রসের্পিনকে হরণ করতে চেয়েছিলেন। প্লুটো তাঁদের একখানি চুম্বক পাথরের ওপরে বসিয়ে রেখে দিয়েছেন। তাঁরা সেই পাথরের আকর্ষণ মুক্ত হতে পারছেন না।

হারকিউলিস প্রেতভূমিতে গিয়ে রাজা ও রাণীকে প্রণাম করলেন। তাঁরা খুশি হয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। প্লুটো জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি চাই বলো !

আমি সার্বেরাসকে মর্ত্যে নিয়ে যাবো।

তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে প্লুটো বললেন, বেশ নিয়ে যাও কিন্তু একটি সর্তে।

কি সর্ত প্রভু ?

বিনা অস্ত্রে ওকে তোমার বন্দী করতে হবে।

আমার আরও একটি প্রার্থনা আছে দেবরাজ !

কি ?

আশা করি এতদিনে থেসিউস ও পিরিথোসের শাস্তি পূর্ণ হয়েছে। আমি ওদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

রাজা রাণীর দিকে তাকালেন। একটু ভেবে রাণী উত্তর দিলেন, তা হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে। অনেকদিন হয়ে গেল ওরা পাথরের ওপর বসে আছে। এখন তুমি ওদের মুক্তি দিতে পারো !

রাণীর কথায় সম্মত হলেন রাজা। তিনি হারকিউলিসকে বললেন, তুমি যদি খালি হাতে ওদের ঐ পাথর থেকে টেনে তুলতে পারো, তাহলে মর্ত্যে নিয়ে যাও।

রাজা ও রাণীর সঙ্গে হারকিউলিস এলেন সেই পাথরের কাছে। ওরা তাঁকে দেখতে পেয়েই কেঁদে উঠলেন। বললেন, আর কোনদিন এমন অন্যায় করব না। আপনি আমাদের মুক্তি দিন হে মহারাণী !

রাণী মৃদু হেসে হারকিউলিসকে ইসারা করলেন। হারকিউলিস এগিয়ে গিয়ে দুহাতে থেসিউসের দুখানি হাত ধরে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে টান মারলেন। থেসিউস মুক্ত হলেন। আনন্দে তিনি

পরমবন্ধু হারকিউলিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এবারে পিরিথৌসের পালা। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও হারকিউলিস তাঁকে মুক্ত করতে পারলেন না। দুজনেই অঝোরে কাঁদতে থাকলেন। হারকিউলিসকে সান্ত্বনা দিয়ে প্লুটো বললেন, দুঃখ করো না। ওর পাপ বেশি। তাই এখনও শাস্তি শেষ হয় নি। শেষ হলে আমি নিজেই ওকে মুক্তি দিয়ে দেব।

তারপরে রাজা ও রাণীর সামনেই শুরু হল হারকিউলিস ও সার্বেরাসের মল্লযুদ্ধ। অসংখ্য আঘাত সয়ে বহু চেষ্টার পরে শেষ পর্যন্ত হারকিউলিস একসঙ্গে সার্বেরাসের তিনটি গলা টিপে ধরতে পারলেন। একটু বাদেই সার্বেরাস অজ্ঞান হয়ে গেল।

দেব ও দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে হারকিউলিস হিংস্র শ্বাপদের সেই অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিলেন। তারপরে প্রিয়বন্ধু থেসিউসের সঙ্গে রওনা হলেন মর্ত্যলোকের পথে।

—বাঁচা গেল! এতদিনে মুক্ত হলেন হারকিউলিস। সুপিন বলে ওঠে। তাঁর স্বরেও মুক্তির পরশ।

হেসে বলি—আজ তাহলে এখানেই থাক।

—কেন, ব'লো তো? তুমি কি ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছো, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?

—না, ঠিক তা নয়। তবু এখন থাক্ না, বাকিটা আরেক সময় বলব।

—আঙ্ক্‌ল, প্লীজ। সবে তো সন্ধ্যে হয়েছে, বাকিটুকু বলতে আর কত সময় লাগবে।

অতএব আবার আরম্ভ করি—

বারো বছর দাসত্ব এবং বারোটি অসম্ভব কাজ সম্ভব করে হারকিউলিস তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তিনি মুক্তি পেলেন। ভাবলেন এবার তিনি আবার সংসার পাততে পারবেন। সুখে ও শান্তিতে বাকি জীবনটা কেটে যাবে!

কয়েকদিন বাদে তাঁর কানে এলো. ইকালিয়া রাজ্যের রাজা

ও বিখ্যাত তীরন্দাজ ইউরিটাস ঘোষণা করেছেন, লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় যে তাঁকে পরাজিত করতে পারবে, তিনি পরমাসুন্দরী কন্যা ইয়োল-কে তারই হাতে তুলে দেবেন।

হারকিউলিস ইকালিয়া গিয়ে ইউরিটাসের সঙ্গে দেখা করে ইয়োলের পাণিপ্রার্থী হলেন। তারপরে রাজাকে ধনুর্বিদ্যায় পরাজিত করলেন।

কিন্তু রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না। বললেন, স্ত্রী-পুত্রহন্তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

মর্মাহত হারকিউলিস তখন স্থির করলেন, আগে তাঁকে রাজা হতে হবে, তারপরে বিয়ে। তিনি যার গোশালা পরিষ্কার করে পঞ্চম শ্রম সম্পূর্ণ করেছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতক আগিয়াসের ইলিশ রাজ্য আক্রমণ করলেন। আগিয়াস পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। হারকিউলিস ইলিশের সিংহাসনে বসলেন। তারপরেই তিনি ওলিম্পিক উৎসবের প্রচলন করেন। পিতা জুপিটারের নামে এই উৎসবকে উৎসর্গ করলেন। কথিত আছে জুপিটার সেই উৎসব-প্রাঙ্গণে এসে মানুষের রূপ নিয়ে হারকিউলিসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পরাজয় বরণ করেন।

ওলিম্পিক উৎসবের পরে হারকিউলিস আরও কয়েকটি রাজ্য জয় করলেন। বহু বন্যজন্তু এবং কয়েকজন দস্যুকে হত্যা করে তিনি গ্রীসবাসীদের জীবনকে নিরাপদ করলেন। তারপরে শুনতে পেলেন ক্যালিডন রাজ্যের রাজা ইউনিস তাঁর ছোটমেয়ে ডিয়ানিরার জন্য পাত্রের সন্ধান করছেন। শুনলেন ডিয়ানিরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী।

হারকিউলিস ক্যালিডনে এসে রাজার কাছে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। আর তাঁকে দেখে অন্যান্য পাণিপ্রার্থীরা গেলেন পালিয়ে। কেবল রয়ে গেলেন নদী দেবতা আকেলাস। তাঁর কোন ভয় ছিল না কারণ তিনি ইচ্ছেমত রূপ পাল্টাতে পারতেন।

এদিকে ডিয়ানিরা কিন্তু হারকিউলিসকে দেখেই মনে মনে তাঁকে পতিরূপে বরণ করে নিলেন। তারপরেই বহুরূপী আকেলাসের সঙ্গে

হারকিউলিসের মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

বেশিক্ষণ যুযতে পারলেন না আকেলাস। হারকিউলিস তাঁকে চিং করে বুকের ওপরে উঠে বসলেন। রাজা হারকিউলিসের জয় ঘোষণা করতে যাবেন, এমন সময় আকেলাস সাপের রূপ নিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। শিউরে উঠলেন ডিয়ানিরা।

রূপ পাল্টে কিন্তু তেমন একটা সুবিধে হল না আকেলাসের। হারকিউলিস ছুটে গিয়ে সাপটার গলা টিপে ধরলেন। বললেন, আরে তোর মতো সাপকে আমি মায়ের কোলে বসে সাবাড় করেছি।

আকেলাসের দম বন্ধ হয়ে এলো। তিনি বৃষরূপ ধারণ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপরেই শিং উচিয়ে হারকিউলিসকে আক্রমণ করতে এলেন। আবার কেঁপে উঠলেন ডিয়ানিরা।

তখুনি হারকিউলিস সেই ষাঁড়ের শিং দুটি ধরে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিলেন। একটা শিং গেল ভেঙে। আকেলাস যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলেন। আর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন ডিয়ানিরা।···

হাততালি দিয়ে উঠল সুপিন। থামতে হয় আমাকে। সুপিন বলে—তারপরে একদিন 'ফরচুন' বা 'গডেস অব্ প্লেন্টি' সেই শিংটা কুড়িয়ে পেলেন। 'She was so much pleased with its shape that she filled it with autmn-fruits and flowers and took it for her emblem. And this is the story of the origin of the Horn of Plenty, which we see at so many of our autmn festivals.'

হেসে বলি—না, তুমি কুপার সাহেবের বইখানি সত্যই মনযোগ দিয়ে পড়েছো।

আমি খুশি হলেও চন্দ্র কিন্তু অসন্তুষ্ট। সে গম্ভীর স্বরে সুপিনকে বলে—তুমি সত্যিই বড় ডিস্টার্বিং। গল্পের মাঝে কি পাণ্ডিত্য না দেখালেই নয়!

—আই অ্যাম সরি আঙ্কল, তুমি বলো।

আমি শুরু করি—

রাজা ইউনিস মহাসমারোহে হারকিউলিসের সঙ্গে ডিয়ানিরার বিয়ে দিলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন হারকিউলিস! ভাবলেন, এবারে তাঁর অভিশপ্ত জীবন সত্যই শেষ হল।

বউ নিয়ে হারকিউলিস রওনা হলেন দেশে। কিন্তু পৌঁছতে পারলেন না। পথে পড়ল ইভেনাস নদী। জলে ভরপুর, প্রবল স্রোত। হারকিউলিস নিজে পার হতে পারেন কিন্তু ডিয়ানিরাকে ওপারে নিয়ে যাবেন কেমন করে?

এমন সময় একজন সেণ্টুর বা অশ্বমানব সেখানে এসে হাজির হল। সে হারকিউলিসকে বলল, আপনি ওপারে চলে যান, আমি রাজকুমারীকে আপনার কাছে দিয়ে আসছি।

হারকিউলিস বিশ্বাস করলেন তাকে। তিনি খুশি মনে নদীতে ঝাঁপ দিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপারে পৌঁছে গেলেন।

পৌঁছবার পরই ডিয়ানিরার আর্তচিৎকার কানে এলো তাঁর। তাকিয়ে দেখেন, অশ্বমানবটা ডিয়ানিরার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। তিনি হাইড্রার বিষমাখা তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর এসে লাগল সেই অশ্বমানবের বুকে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার রক্তের সঙ্গে হাইড্রার বিষ গেল মিশে। বিষরক্তে তার জামা ভিজে গেল।

অনেক কষ্টে অশ্বমানব বুক থেকে বাণটা টেনে বের করল। তারপরে গায়ের রক্তমাখা জামাটা খুলে ফেলে ডিয়ানিরার হাতে দিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তবু আমি আপনার একটা উপকার করে আমার পাপের বোঝা কিছু কমাতে চাই। আপনার স্বামী আসার আগেই আপনি তাড়াতাড়ি এই জামাটা আপনার হাতের থলির ভেতরে লুকিয়ে ফেলুন। যদি কখনও আপনার স্বামী আপনার কাছে অবিশ্বাসী হন, তখন তাঁকে আমার কথা গোপন করে এই জামাটি পরিয়ে দেবেন। দেখবেন, আমার রক্তের গুণে তিনি পুনরায় আপনার প্রতি প্রেমময় হয়ে উঠবেন।

সরলা ডিয়ানিরা তার কথা বিশ্বাস করে সযত্নে সেই শয়তানের

জামাটা নিজের থলিতে লুকিয়ে রাখলেন।

এই অশ্বমানবটি সত্যই শয়তান। তার নাম নিসাস। একবার হারকিউলিসের কাছে সে খুব মার খেয়েছিল। তাই সে তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করতেই এসেছিল। ভেবেছিল হারকিউলিস নদী সাঁতরে ফিরে আসবার আগেই পালিয়ে যাবে। পালিয়ে সে সত্যই গেল। একেবারে ইহলোক ছেড়ে নরকে।

হারকিউলিস ডিয়ানিরাকে নিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরে এলেন। এবং সুখে সংসার করতে লাগলেন। পতিপরায়ণা ডিয়ানিরা কিন্তু নিসাসের সেই বিষরক্তমাখা জামাটার কথা কিছুই বললেন না তাঁকে।

মাস যায়, বছর কাটে, যুগ ফুরিয়ে আবার নতুন যুগ শুরু হয়। ডিয়ানিরাকে নিয়ে হারকিউলিসের জীবন আরও আনন্দময় হয়ে ওঠে। এই সময় একদিন হারকিউলিস খবর পেলেন টাইটান মানে দৈত্যদল অলিম্পাস আক্রমণ করেছে, দেবতারা তাদের সঙ্গে সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। এবং এরকম চললে কিছুদিনের মধ্যেই দেবতাদের স্বর্গ ছেড়ে পালাতে হবে।

হারকিউলিসের শক্তি সাহস এবং বুদ্ধির কথা জুপিটার সবই জানতেন। তাঁর পিতৃভক্তির কথাও অজানা ছিল না দেবরাজের। অথচ এতবড় বিপদেও তিনি ছেলেকে ডাকতে পারছিলেন না। কারণ জুনো হারকিউলিসের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তারপরে জুপিটারের পক্ষে ছেলের কাছে কোন সাহায্য চাওয়া সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণা জুনোই একদিন দেবরাজকে বললেন হারকিউলিসের কথা। বললেন, আমি তাকে সারাজীবন কষ্ট দিয়েছি, তবু সে মহৎ এবং উদার। আমাদের এই বিপদে সে সাহায্য না করে পারবে না।

দেবরাণীর অনুতাপ দেখে খুশি হলেন দেবরাজ। তিনি হারকিউলিসকে ডেকে পাঠালেন। হারকিউলিস অলিম্পাসে গিয়ে বাপ-মাকে প্রণাম করলেন। দেবরাণী ছেলের কাছে আরেকবার তাঁর কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, এই বিপদে

যদি তুমি আমাদের সাহায্য না করো, তাহলে যে আমাদের স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হবে বাবা !

এ আপনি কি বলছেন মা ! প্রয়োজনে আমি প্রাণের বিনিময়েও স্বর্গ রক্ষা করব।

তাই করলেন হারকিউলিস। দেবসৈন্যদের সহায়তায় কয়েক-দিনের মধ্যে তিনি দৈত্যদের সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন, অলিম্পাস দেবালয় রয়ে গেল।

—হয়ে গেল ? আমি থামতেই সুপিন বলে ওঠে।

হেসে বলি—হ্যাঁ। আর কি সবই তো বললাম।

—কেন সেই 'পয়েজন্‌ড সার্ট'-এর কথা বলবেন না ?

—সে তো তুমি জানই।

—তা হোক্ গে, তবু বলো।

না, এ নাছোড়বান্দা মেয়ের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং সময় নষ্ট না করে হারকিউলিসের দুঃখময় জীবনের শেষটুকু স্মরণ করা যাক, আমি শুরু করি—

তারপরে আরও কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও মহত্তম মানুষ রূপে হারকিউলিস তখন ত্রিভুবনে সমান শ্রদ্ধেয়। ঘরে তাঁর পতিপরায়ণা পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও ফুলের মতো পবিত্র ও সুন্দর ছেলে-মেয়ে।

তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। বিশ্বাসঘাতক ইউরিটাসকে শাস্তি দেওয়া হয় নি। কথা দিয়েও তিনি তাঁর মেয়ে ইয়োলকে দান করেন নি। অথচ ইয়োল এখনও বিয়ে করে নি। সে নিশ্চয়ই তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছে।

বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে হারকিউলিস ইকালিয়া আক্রমণ করলেন। ইউরিটাস ও তাঁর ছেলেরা যুদ্ধে মারা গেল। রাজকুমারী ইয়োলকে নিয়ে হারকিউলিস হওনা হলেন দেশের পথে।

সংবাদটি পতিপরায়ণা ডিয়ানিরার কানে এসে পৌছল। হারকিউ-লিসের কাছেই তিনি এই মেয়েটার কথা শুনেছেন। ওকে পেয়ে

এবারে তো স্বামী তাঁকে ভুলে যাবেন। না, না, এ হতে পারে না। স্বামীর ভালোবাসা না পেলে যে তিনি একটা দিনও বাঁচবেন না।

তাঁর মনে পড়ল সেই অশ্বমানব নিসারের রক্তাক্ত জামাটার কথা। সে বলেছিল, যদি কখনও আপনার স্বামী আপনার কাছে অবিশ্বাসী হন, তখন তাঁকে এই জামাটি পরিয়ে দেবেন। দেখবেন আমার রক্তের গুণে তিনি পুনরায় আপনার প্রতি প্রেমময় হয়ে উঠবেন।

স্বামী সোহাগিনী ডিয়ানিরা তাড়াতাড়ি জামাটি বের করে লিচাস নামে জনৈক পরিচারকের হাতে পাঠিয়ে দিলেন স্বামীর কাছে। প্রেমপত্রে লিখলেন, আমার বড় ইচ্ছে তুমি পত্রপাঠ এই জামাটি গাঁয়ে দেবে এবং এই জামা পরেই ফিরে আসবে আমার কাছে।

রাজধানীর উপকণ্ঠে একটা বনভূমিতে হারকিউলিস তখন শিবির ফেলেছেন। মনে তার বড়ই আনন্দ এতদিন বাদে বিশ্বাসঘাতক ইউরিটাসকে শাস্তি দিয়েছেন. ডিয়ানিরার জন্য অপরূপা ইয়োলকে সখী নিয়ে যাচ্ছেন। দুজনে মিলে-মিশে তাঁর সংসারকে আরও বেশি শান্তিময় ও সুন্দর করে তুলবে। এই আশীর্বাদের জন্য তিনি তখন আগুন জ্বেলে পিতা জুপিটারের উপাসনা শুরু করেছিলেন।

লিচাস এসে উপস্থিত হল। তিনি উপাসনা বন্ধ করে পতিপরায়ণা ডিয়ানিরার পত্রখানি পাঠ করলেন। তারপরে সেখানি ইয়োল-র হাতে দিয়ে জামাটি গায়ে দিয়ে পুনরায় পিতার উদ্দেশে উপাসনা শুরু করতে চাইলেন।

পারলেন না। জামাটি গায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা শরীরে শুরু হল তীব্র জ্বালা। মুহূর্তে হাইড্রার বিষ রোমকূপের ভেতর তাঁর শরীরে প্রবেশ করে রক্তের সঙ্গে মিশতে থাকল। যন্ত্রণা পাগল হারকিউলিস জামাটা ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু সেটা ততক্ষণে তাঁর গায়ে সেঁটে গিয়েছে।

জামা ছিড়তে না পেরে তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল লিচাসের ওপর। তিনি তাকে হত্যা করলেন। তারপরে যজ্ঞস্থল ছেড়ে বনে প্রবেশ করলেন। ছটফট করে ছোটাছুটি করতে থাকলেন আর মাঝে

মাঝে বলে উঠলেন—ডিয়ানিরা, প্রিয়তমা! এ কি করলে তুমি?

ইয়োল তাঁর এই কষ্ট আর দেখতে পারলেন না। কি করবেন বুঝতে না পেরে তিনিও পাগলের মতো ছুটে এলেন প্রাসাদে। ডিয়ানিরার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—দিদি, তুমি ওকে বাঁচাও।

সব শুনে ডিয়ানিরা বুঝতে পারলেন, তিনি নিজ হাতে তাঁর ত্রিভুবনজয়ী স্বামীকে মৃত্যুবাণ মেরেছেন। তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। পতিপ্রিয়া ডিয়ানিরা ক্ষোভে ও দুঃখে আত্মহত্যা করলেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে হারকিউলিসকে পেয়েছিলেন ইয়োল। ভেবেছিলেন এবারে তাঁর কুমারী জীবন সার্থক হবে। কিন্তু সেই সুখের ফুল ফুটতে পারার আগেই ঝরে পড়ে গেল। তাঁর যে কিছুই থাকল না। বাপ গেছেন, ভাইরা গেছেন, এবারে হারকিউলিসও চলে যাবেন। হারকিউলিসকে হারিয়ে এই ব্যর্থ জীবন বয়ে বেড়াবেন কেমন করে? না, তিনিও চলে যাবেন। ইহকালে মনের মানুষকে পেলেন না, পরকালে তাঁর সঙ্গী হবেন। মৃত ডিয়ানিরার হাত থেকে বিষপাত্রটি নিজের হাতে তুলে নিলেন ইয়োল। বাকি বিষটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে ডিয়ানিরার পাশে ঢলে পড়লেন।

হারকিউলিস বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তিম লগ্ন উপস্থিত। জীবনযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সারা জীবনই যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। ঈর্ষাপরায়ণা জুনোদেবীর অভিশাপের বিরুদ্ধে, নিজের মন্দ ভাগ্যের বিরুদ্ধে। এবারে সব যুদ্ধ শেষ, মুক্তি আগত ঐ।

কিন্তু কাপুরুষের মৃত্যু তো তাঁর জন্য নয়। তিনি বীর। বীরের মৃত্যুই বরণ করবেন। সেই অবস্থায় তিনি টলতে টলতে বন থেকে কাঠ কেটে নিজেই নিজের চিতা সাজালেন। তারপরে সেই চিতার ওপরে উঠে বসলেন। সঙ্গীদের আগুন দিতে বললেন।

অনুগত ফিলেক্‌টেটিস সে আদেশ পালন করতে এগিয়ে এলেন। কৃতজ্ঞ হারকিউলিস তাঁকে নিজের ধনুর্বাণ উপহার দিলেন।

চিতা জ্বলে উঠল। সেই আগুনে তাঁর বিষজ্বালা কমে গেল।

তিনি পরমতৃপ্তিতে চোখ বুজলেন। আগুনের পরশমণি রণক্লান্ত মহাবীরকে মহাশান্তি দান করল।

খবর পেয়ে দেব-দেবীরা ছুটে এলেন। ছুটে এলেন স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার। তাঁর মনে পড়ল প্রিয়তমা আল্কমিনার কথা। তাঁর চোখদুটি জলে ভরে উঠল। তারপরেই তিনি চোখ মুছে ঘোষণা করলেন—হারকিউলিস মানুষ হলেও ত্রিভুবনের সবশ্রেষ্ঠ বীর। তিনি দেবতাদের রক্ষাকর্তা। তাঁর মৃত্যু নেই।

জুপিটার বজ্রাঘাতে চিতার আগুন নিবিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্মশান থেকে জেগে উঠলেন অমর হারকিউলিস। পিতার সঙ্গে পুত্রও গিয়ে দেবরাজের স্বর্ণরথে আরোহণ করলেন। রথ রওনা হল অলিম্পাসের পথে।

মর্ত্যের হারকিউলিস স্বর্গে চলে গেলেন। দেবরাজসভায় তিনি স্থায়ী আসন লাভ করলেন। '...so the story goes, Hercules became one of mighty company of Gods in high Olympus.'

আট

প্রাতরাশের পরে চন্দ্র ও সুপিনের সঙ্গে নেমে আসি রিসেপশানে। কাছে আসতেই সুপ্রভাত জানিয়ে রিসেপশানিস্ট জিজ্ঞেস করেন—কাল রাতে আর ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি তো?

কাল এঁরা আমার ঘর পাল্টে দিয়েছেন। সেই 'রোড সাইড, সাউথ ওপেন' ঘরখানির পরিবর্তে পেছনের একখানি ঘর। এ ঘরখানায় বাইরের আলো কম, টেরাসে দাঁড়ালে পেছনের বাড়িটা শুধু দেখা যায়। কিন্তু একেবারে গাড়ির শব্দ নেই। কাল রাতে ঘুমের কোন অসুবিধে হয় নি।

আরও একটি সুবিধে হয়েছে। আমার ছিল ৩০৫ নম্বর ঘর,

চারতলায়। এখন হয়েছে ৫৩৫ অর্থাৎ ছ'তলায়। সুপিনরাও একই তলায় থাকে। ওদের নম্বর ৫৩১। সুতরাং সবসময় যাওয়া-আসা করা যাচ্ছে। পরিচিত জন ছাড়া সংসারে কি বেঁচে থাকা সম্ভব? মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অথচ ওরা যেন আমার কতকালের চেনা, কত আপনজন। বলা বাহুল্য এটা সুপিনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। মেয়েটার বড়ই মায়ার শরীর।

—একি আঙ্কল! ভদ্রলোকের কথার জবাব দিচ্ছ না যে? কাল রাতে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি তো?

—না, না। একেবারে নয়। চমৎকার ঘুম হয়েছে, ভারী শান্ত ঘরখানি, রাস্তার শব্দ কানে আসে না। আপনাকে ধন্যবাদ ভাই, অনেক ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক খুশি হন। তারপরে জিজ্ঞেস করেন—এবারে বলুন, আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি?

উত্তর দেয় চন্দ্র—আমরা আজ একটা আফটারনুন বাসট্যুর করতে চাইছি।

—কোথায় যাবেন?

—সেটা ঠিক করতে না পেরেই তো আপনার কাছে এলাম।

একটুকাল চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বলেন—আপনারা 'সউনিয়ন' (Sounion) দেখে আসুন।

—সউনিয়ন! সুপিন বোধহয় নামটা শোনে নি এর আগে।

—হ্যাঁ। সউনিয়ন। গ্রীসের এই মধ্যাঞ্চলের দক্ষিণতম প্রান্ত। স্যারোনিক গালফ, ঈজিয়ান সী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনক্ষেত্র। সেখানে রয়েছে 'দি টেম্পল অব্ পজিডন' (Poseidon)। অসাধারণ সুন্দর অবস্থান। সেখানে দেখতে পাবেন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, দেখতে পাবেন ভূমধ্যসাগরের সুন্দরতম সূর্যাস্ত আর সাগরের বালুকাবেলা ধরে অপরূপ একটি মোটরপথ।

—বেশ। আমরা যাবো। জনপ্রতি কত করে ভাড়া দিতে হবে?

ভদ্রলোক ট্যুর এজেন্সীর সেই লাল পুস্তিকাখানি দেখে নিয়ে

বলেন—৯০০ দ্রাশমাস তার মানে ১৫ ডলার।

—ঠিক আছে। কখন বাস আসবে?

ভদ্রলোক খাতা খুলে আমাদের নাম ও ঘরের নম্বর লিখে নিয়ে বলেন—বিকেল চারটায়। ফিরে এসে ডিনার করতে পারবেন।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা লাউঞ্জ পার হয়ে বাইরে আসি। আর তখুনি দেখতে পাই।

না, কোন মানুষ নয়, একখানি মোটরবাইক। সচরাচর যেসব গাড়ি দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বড়।

চন্দ্র বলে ওঠে—বাই জোভ! ফাইভ হর্স পাওয়ার!

অশ্ব-শক্তি সম্পর্কে আমার কোন ধারনা নেই। আর তাই চন্দ্রের দিকে তাকাতেই সে আমাকে বুঝিয়ে দেয়—আমরা যেসব বাইক ব্যবহার করি, সেগুলো দেড় থেকে সাড়ে তিন হর্স পাওয়ারের। আর এটার ফাইভ হর্স পাওয়ার।

হর্স পাওয়ার সম্পর্কে কোন ধারনা না থাকা সত্ত্বেও আমি আকৃষ্ট হয়েছি দুটি কারণে। প্রথমত গাড়িটার আকারে, দ্বিতীয়ত তাতে চাপানো মালপত্রের বহর দেখে। তাঁবু ও স্লীপিং-ব্যাগ থেকে বাসনপত্র পর্যন্ত সবই রয়েছে। বাঁধাবাঁধিটাও দেখার মতো।

এবারে গাড়িটার নম্বরে চোখ পড়ে চন্দ্রের। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে—এতো সুইডেনের নম্বর। তাহলে গাড়ির মালিক এই গাড়ি চড়ে সুইডেন থেকে এখানে এসেছেন।

ওর পক্ষে চিৎকার করে উঠবার মতই বটে। ওর জন্মভূমি সুইডেন। আর তাই ওরা লণ্ডন না গিয়ে স্টক্‌হোম যাচ্ছে।

আমারও ভাল লাগছে। আমিও সুইডেন গিয়েছি। স্থলপথে সুইডেন গ্রীস থেকে বহুদূর। দুটি দেশ এই মহাদেশের দুইপ্রান্তে অবস্থিত। মাঝখানে সমুদ্র পর্যন্ত রয়েছে। অবশ্য গাড়ি নিয়ে সাগর পার হতে অসুবিধে নেই। অনবরত বড়-বড় জাহাজ চলছে। তাতে মোটরবাইক দূরের কথা, রেলগাড়ি পর্যন্ত পারাপার করছে।

অতএব ওদের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে থাকি হোটেলের সামনে।

এই অতিকায় মোটরবাইকের মালিককে দেখতে হবে একবার।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একজন স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ ও জনৈকা স্বাস্থ্যবতী বৃদ্ধা হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িটার কাছে আসেন। বৃদ্ধের হাতে একটা ব্রীফকেস ও বৃদ্ধার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড লেডিজ ব্যগ। দুজনেরই বয়স বোধকরি সাতের ঘরে।

চন্দ্র এগিয়ে ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করে। আমাদের পরিচয় দেয়। করমর্দনের পালা শেষ হবার পরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে—আপনারা কি সুইডেন থেকে এই গাড়িতে এখানে এলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানতে পারলেন কেমন করে?

—গাড়ির নম্বরটা দেখে। আমারও যে জন্ম সুইডেনে, আমি গোটেবর্গে স্কুল-কলেজের পাঠ শেষ করেছি।

ভদ্রলোক দুহাতে চন্দ্রকে বুকে টেনে নিয়ে উচ্ছসিত স্বরে বলে ওঠেন—তাহলে তুমি আমার ভাই, জন্মসূত্রে ছোটভাই!

—ব্যস দাদা-ভাই মিলে গেল আর আমরা পর হয়ে রয়ে গেলাম।

সুপিনের মন্তব্য শুনে হেসে দেন ভদ্রমহিলা। তিনি তাড়তাড়ি তার একখানি হাত হাতে নিয়ে বলে ওঠেন—না ভাই, তুমিও আমার বোন। এই নাও চকোলেট খাও!

এতক্ষণে আমি কথা বলি—সুইডেন আমার জন্মভূমি নয়, তবে আমিও আপনাদের দেশে গিয়েছি। ভারী সুন্দর দেশ। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা আমি ডঃ স্বেন হেডিন-এর একজন মানস-শিষ্য। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'Trans Himalaya' পাঠ করে আমি লাদাখ গিয়েছি এবং আজও হিমালয়ের দুর্গম পথে পদচারণা করে চলেছি।

—রিয়েলী! ওঁরা দুজনেই খুশি হন।

আমি সানন্দে মাথা নেড়ে বলি—সত্যি, আপনারাই স্বেন হেডিনের যোগ্য উত্তরসূরী। নইলে এই বয়সেও আপনাদের অ্যাডভেঞ্চার-এর প্রতি এমন মোহ থাকবে কেন? বিমানে কিম্বা রেলে না এসে মোটরবাইকে এই দীর্ঘপথ পাড়ি দেবেন কেন?

—এখান থেকে আপনারা কোথায় যাবেন? আমি থামতেই

সুপিন জিজ্ঞেস করে।

—এবারে আর কোথাও যাচ্ছি নে। এখুনি দেশের পথে রওনা দেব। গতবার বাগদাদ গিয়েছিলাম, তার আগের বছর ব্লাদিভস্তক।

—আপনারা কি প্রতিবছরই এমনি বেড়াতে বের হন? চন্দ্র জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রলোক উত্তর দেন—না, সব বছর হয়ে ওঠে নি, তবে অধিকাংশ বছর। কি করব বল, 'রিটায়ার্ড' মানুষ, ছেলে ও মেয়ে কাছে থাকে না, নিজেদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তাই গ্রীষ্মকালটা দুজনে একটু মনের মতো ঘুরে বেড়াই।

—সব সময় কি হোটেলেই ওঠেন?

—শহর পেলে সাধারণত তাই করি। তবে অনেক সময়েই তো পথে-প্রান্তরে রাত হয়ে যায়, কখনও পাহাড়ে কখনও বনে কখনওবা নদীর তীরে কোন বিজন প্রান্তরে।

—তখন কি করেন?

—সুবিধেমত ক্যাম্প-সাইট খুঁজে নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে নিই।

—ভয় করে না।

সুপিনের প্রশ্ন শুনে হেসে দেন ভদ্রমহিলা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বলেন—ভয়! ভয় কিসের? বন্যজন্তু সাধারণত অটোবানে (Auto-bahn : Inter-country Super-highway) আসে না। চোর-ডাকাতের ভয়, আমাদের নেই। ক্যাশ ক্রোনার (সুইডেনের টাকা) আমরা সামান্যই সঙ্গে রাখি, সবই ট্রাভেলার্স চেক। তাছাড়া আমাদের দুজনেরই দুটি পিস্তল আছে।

আরও কয়েক মিনিট কথা বলে ওঁরা বিদায় নেন। দুজনে বাইকে ওঠেন। সশব্দে গাড়িটা চলতে শুরু করে। অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে আরেকবার হাত নাড়েন।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে চলি। সত্যি, এই বয়সেও কি বৈচিত্র্যময় রোমান্টিক জীবন যাপন করে চলেছেন। বার বার রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটি মনে পড়ছে—

'... ... . বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া.
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে ; ... ...'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্রীস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে আসি। ডলার ভাঙাতে হবে। ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকে ভাল লাগে আমার। ভারী সুন্দর সাজানো-গোছানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সবচেয়ে ভাল লাগছে কাউন্টারে কর্মরত কর্মীবৃন্দকে দেখে। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। অথচ সবার পাশেই বসার চেয়ার রয়েছে।

এক্সচেঞ্জ কাউন্টারের কর্মীটিও দাঁড়িয়েই কাজ করছেন। যেমন চটপটে, তেমনি মার্জিত ব্যবহার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ও চন্দ্র ড্রাশমাস পেয়ে যাই।

ব্যাঙ্কের বাইরে আসার পরে সুপিন জিজ্ঞেস করে—এখুনি কি হোটেলে ফিরে যাবো ?

—তোমার কি ইচ্ছে ? ওকে পাল্টা প্রশ্ন করি।

—আমার ইচ্ছে, ঐ পার্কটায় কিছুক্ষণ বসি। বসে বসে তোমার কাছে গ্রীস আর এথেন্সের কথা শুনি। আজ আমাদের বাসট্রিপ তো সেই বিকেল চারটায়। এখন সবে সকাল সাড়ে ন'টা।

—প্রস্তাবটা মন্দ নয়। চন্দ্র আমার দিকে তাকায়।

সেকি ! এযে জামাইও দেখছি অনুগত স্বামীর মতো কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।

—কিন্তু…

—কোন কিন্তু নয় আঙ্ক্‌ল! তিনজনের মধ্যে আমরা দুজন যখন একমত হয়েছি. তখন তো তোমার একা আপত্তি করা একেবারেই অগণতান্ত্রিক ব্যাপার হবে।

অতএব ওদের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে পার্কে আসতে হয়। এথেন্সের-রাস্তাগুলো ভারী সুন্দর। যেমন মসৃণ ও প্রশস্ত, তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানেও পথের ডানদিক দিয়ে গাড়ি চলে এবং তা খুবই জোরে। সুতরাং যেখানে ট্রাফিক সিগন্যাল নেই, সেখানে রাস্তা পার হতে একটু ভয়-ভয় করে। অথচ জানি এদেশে গাড়ির চালকরাও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের চালকদের মতই সর্বদা পথ-চারীদের প্রথম রাস্তা পারাপারের সুযোগ দেন। কাউকে রাস্তা পার হতে দেখলেই গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে আনেন। য়ুরোপে যে জীবনের দাম বড় বেশি।

পার্কটি প্রকাণ্ড না হলেও ভারী সুন্দর। একদিকের খানিকটা অংশ জুড়ে ফুলের বাগান আর শিশু উদ্যান—দোলনা, স্লীপ, ঘূর্ণি, ভূতের বাড়ি ইত্যাদি অনেক খেলার উপকরণ। আর রয়েছে নরম ঝুরোমাটির একফালি জমি। কুস্তির আখড়ার মতো হলেও কুস্তির জন্য নয়, শিশুদের মাটি মাখার জন্য। মাসছয়েক থেকে বছর-তিনেকের ছেলে-মেয়েদের খালিগায়ে ঐ মাটিতে বসিয়ে দিয়ে মায়েরা পাশের বেঞ্চিতে বসে বই পড়েন কিম্বা উল বোনেন। ছেলে-মেয়েরা গায়ে মাটি মেখে মাটির মধ্যে লুটোপুটি খায়। এটা নাকি ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। ঘরে তো কারও মাটি নেই। তাই পার্কে পার্কে শিশুদের এই মাটি মাখার ব্যবস্থা।

শিশু-উদ্যান ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গাছের ছায়ায় একখানি খালি বেঞ্চি পেয়ে যাই। এবং সেখানিতে বসে পড়েই সুপিন ফরমাশ করে—এবারে শুরু করো।

অতএব বলতে থাকি—আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এথেন্স একটি সুপরিচিত নাম। তাহলেও গ্রীকসভ্যতার এই

কেন্দ্রভূমি কিন্তু প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে অবহেলিত হয়েছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে মহামতি কনস্তানতাইন রোমের সিংহাসনে বসেন। গ্রীস তখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু রোমে তখন বড়ই অশান্তি। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে অখ্রীষ্টানদের সংঘর্ষ লেগেই আছে। বিচক্ষণ উদার ও ভবিষ্যতদ্রষ্টা সম্রাট বুঝতে' পারলেন খ্রীষ্টানদের সহায়তা ছাড়া সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় পতাকায় ক্রুশ অঙ্কিত করিয়ে খ্রীষ্টানদের খুশি করলেন। তারপরে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করলেন। খ্রীষ্টানগণ সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিলেন।

সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে সম্রাট কনস্তানতাইন কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাইজেন্তিয়াম নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। নিজের নামে রাজধানীর নাম রাখলেন কনস্তান্তিনোপল।

—মানে একালের ইস্তাম্বুল। মাঝখান থেকে চন্দ্র বলে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলতে থাকি—মৃত্যুর আগে সম্রাট কনস্তানতাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে রোমান সাম্রাজ্য খ্রীস্টান সাম্রাজ্যে পরিণত হল। আর তারই ফলে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে রোমে পোপের শাসন শুরু হয়। কিন্তু এসব কথা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

আমি বলতে চাইছি কনস্তান্তিনোপলে রাজধানী নিয়ে যাবার পরে এথেন্সের গৌরব আরও ম্লান হয়ে যেতে থাকে। এবং তা চলে তুর্কী শাসনমুক্ত হওয়া অর্থাৎ গত শতাব্দী পর্যন্ত। ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু এবং ১৮২৭ সালে এথেন্স তুর্কী কবল-মুক্ত হয়। কিন্তু এথেন্স তখন প্রায় একটি গ্রামের মতো। তাই স্বাধীনতার পরে পেলোপনিজকে প্রথম দেশের রাজধানী করতে হল। এবং বেশ কয়েক বছর সেখানেই সব সরকারী কাজকর্ম হয়েছে।

কিন্তু দেড় হাজার বছরের সকল গ্লানিকে এথেন্সবাসীরা মাত্র দেড় শ' বছরে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছেন। এখন এথেন্স বিশ্বের একটি

সর্বশ্রেষ্ঠ মহানগরী। বন্দরনগরী পাইরিউস এবং এথেন্সের মিলিত জনসংখ্যা পনেরো লক্ষের মতো। বর্তমানে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং রাজনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি এথেন্স।

—আচ্ছা, শুনেছি রোমান আমলে এ দেশের মানুষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও, এঁরা নাকি রোমান ক্যাথলিক নন? চন্দ্র জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—ঠিকই শুনেছো। এদেশের শতকরা ৯৬জনই অর্থোডক্স গ্রীক চার্চের শিষ্য। কারণ রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব মেনে নিলেও গ্রীস কখনও রোমের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আধিপত্য মেনে নেয় নি। পোপের আমলেই প্যাটরিয়ার্চ (Patriarch) মানে কনস্তান্তি-নোপলের আর্চবিশপ বলে বসেন, তাঁকেও পোপের সমান মর্যাদা দিতে হবে। সেই থেকে অর্থোডক্স গীর্জা আন্দোলনের শুরু। ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থোডক্স মতের প্রচারকরা রাশিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে সমর্থ হন। কারণ ঐ সময়ে একজন রাশিয়ান শাসকের পুত্র জনৈকা গ্রীক-রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। তাঁরা গ্রীক ধর্মপ্রচারকদের খুবই সাহায্য করেন। আর রাশিয়ায় নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার পরে গ্রীক খ্রীষ্টানরা পোপের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়ে দেন।

এখনও প্যাটরিয়ার্চ অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের প্রধান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গ্রীসের সব গীর্জাই স্বাধীন। কেবল এথেন্সের আর্চবিশপ মধ্য-গ্রীসের গীর্জাগুলো দেখা-শোনা করেন। অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে 'চার্চ অব্ ইংলণ্ডে'র সম্পর্ক খুবই ভাল।

আরেকটি কথা, গ্রীসকে তুর্কী কবলমুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার পেছনে অর্থোডক্স গীর্জার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছেন।

—শুনেছি ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণ গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবিশেষ সহায়তা করেছেন?

—ঠিকই শুনেছো। উনবিংশ শতকের প্রথমদিক থেকেই পশ্চিম-য়ুরোপের তরুণ সমাজ গ্রীসের প্রতি দরদী হয়ে পড়েন। তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় গ্রীসের অবদানের কথা স্মরণ করে তুর্কী সাম্রাজ্য-

বাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বৃটেনে এই আন্দোলনের অন্যতম হোতা ছিলেন লর্ড বায়রণ। তিনি কবিতা লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে বৃটিশ সমাজকে গ্রীসের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলেন। কবি পি. বি. শেলীও তাঁর সহযোগী হয়ে পড়েন।

বায়রণ জন্মেছিলেন ১৭৮৮ সালে। ১৮০৯ সালে কেম্ব্রিজে যখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখুনি দেশভ্রমণে বেরিয়ে লিসবন ও আলবেনিয়া হয়ে এথেন্সে আসেন। পরে তিনি কনস্তান্তিনোপলেও যান।

দেশে ফিরে গিয়েই তিনি লণ্ডনের গ্রীক কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এবং গ্রীসের মুক্তির জন্য জনমত গঠন করায় ব্রতী হন। ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। বায়রণের পক্ষে বেশিদিন দেশে বসে থাকা সম্ভব হল না। ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি গ্রীসে চলে আসেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তার শরীর ভেঙে যায়। তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। ১৮২৪ সালের ১৯শে এপ্রিল স্বাধীনতার পূজারী লর্ড বায়রণ গ্রীসের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর।

কবি বায়রণের আত্মত্যাগ বিফলে যায় নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের তিন বছর পরে গ্রীক নৌবাহিনী নাভারিনোর (Navarino) যুদ্ধে তুরস্কের নৌশক্তিকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দেয়। এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে। গ্রীস তাঁর স্বাধীনতা ফিরে পায়।

কৃতজ্ঞ গ্রীসবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বায়রণের অবদানের কথা স্মরণ করেন। বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মরণোত্তর জাতীয় কবিরূপে স্বীকৃতি দান করা হয়। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

আর তাই বোধকরি গ্রীস আজও বৃটিশ পর্যটকদের কাছে এত প্রিয়। প্রতিবছর দলে দলে বৃটিশ পর্যটক এদেশে আসেন। তাঁরা গ্রীসের ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে খুশি হন, গ্রীসবাসীদের আন্তরিক আতিথ্যে মুগ্ধ হন আর গ্রীসদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হন।

—আঙ্কল, একটা কথা বলব ?

আমি থামতেই সুপিন বলে। মাথা নাড়ি। সুপিন যোগ করে—জানো, আমি গ্রীসে বেড়াতে এসেছি কিন্তু এদেশের ইতিহাস জানি না। গাইডদের কথা অনেক সময়েই বুঝতে পারি না। তুমি আমাকে সংক্ষেপে একটু গ্রীসের ইতিহাস বলে দাও না গো! বিশেষ করে ম্যারাথন আর থার্মোপলির কথা।

—আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন, এখন ঠেলা সামলান। চন্দ্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

কিন্তু তাতে আমার কোন সুবিধে হয় না। সুপিন সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে শাসন করে—তুমি চুপ করো তো! তোমার ভালো না লাগে, হোটেলে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকো।

বেচারী চন্দ্র আর কিছু বলতে পারে না। সে নীরব হয়ে যায়।

আর আমাকে সরব হতে হয়—বিশ্বের যে সামান্য কয়েকটি দেশ খ্রীস্টজন্মের বহু আগে সভ্যতার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, গ্রীস তাদের অন্যতম। তাই গ্রীসের ইতিহাস কেবল একটি দেশের উত্থান-পতনের বিবরণ নয়, মানবসভ্যতার এক গৌরবময় অধ্যায়।

কাব্য কলা দর্শন বিজ্ঞান ও স্থাপত্যবিদ্যায় গ্রীস অসাধারণ উন্নতি করেছিল। তাছাড়া গণতন্ত্রের প্রথম বিকাশ হয় গ্রীসে। গ্রীস গণতন্ত্রের জনক।

গ্রীস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সেতুবন্ধন। আলেকজান্দারের বিজয় অভিযানের ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার প্রথম প্রত্যক্ষ মিলন ঘটে।

কিন্তু গ্রীসের ইতিহাস রোমের মতো কোন একক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবিস্তার ও সমৃদ্ধির ইতিহাস নয়। সেকালের গ্রীসদেশ কয়েকটি ছোট-ছোট নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাঁদের মধ্যে এথেন্স, স্পার্টা, থিব্‌স ও মাসিদনের নাম আমাদের সুপরিচিত। এইসব রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের ইতিহাসই গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস। পারস্যের সম্রাট দারায়ুসের গ্রীস আক্রমণ অর্থাৎ ম্যারাথনের যুদ্ধজয়

থেকেই গ্রীস-ইতিহাসের গৌরবময় যুগ শুরু।

—আমিও তো সেইকথাই শুনতে চাইছি। খুশিভরা স্বরে স্বপিন বলে ওঠে। সে সোজা হয়ে বসে।

আমি বলতে থাকি—পারস্য তখন খুবই শক্তিশালী দেশ। জলে ও স্থলে সে তখন অপরাজেয়। শিক্ষা সাহিত্য দর্শন ও স্থাপত্যে গ্রীসের গৌরবের কথা কানে আসায় সম্রাট দারায়ুস অত্যন্ত রেগে গেলেন। ঈর্ষাপরায়ণ সম্রাট খ্রীস্টপূর্ব ৪৯২ অব্দে তাঁর সুবিরাট নৌবাহিনী নিয়ে গ্রীস রওনা হলেন। কিন্তু পৌঁছুতে পারলেন না। পথে প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁর নৌবাহিনী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হল। সম্রাট কোনমতে দেশে ফিরে গেলেন।

দারায়ুস কিন্তু ঈর্ষা ত্যাগ করলেন না। একটু সামলে নিয়েই তিনি আবার অভিযানের আয়োজন আরম্ভ করে দিলেন। তিনি গ্রীসের সমস্ত নগররাষ্ট্রের কাছে চিঠি পাঠালেন। তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করতে বললেন। এথেন্স ও স্পার্টা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্র দারায়ুসের অধীনতা স্বীকার করে নিল। এথেন্স ও স্পার্টা ঘৃণার সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে দারায়ুস তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রীস অভিযান আরম্ভ করলেন। অ্যাটিকার ম্যারাথনে পৌঁছে জাহাজ থেকে অবতরণ করে স্থলপথে এথেন্স অধিকারের পরিকল্পনা করলেন।

খবর পেয়ে এথেন্স স্পার্টার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালো। কিন্তু তখন ছিল শুক্লপক্ষ। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে স্পার্টার সেনাপতি শুক্লপক্ষে যুদ্ধ করতে সম্মত হলেন না। তিনি এথেন্সকে কৃষ্ণপক্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু ততদিনে পারস্যের সেনাবাহিনী ম্যারাথনে অবতরণ করেছে। এথেন্সের পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। এথেনীয় সেনাপতি মিলতিয়াদিস (Miltiadis) মাত্র নয় হাজার সৈন্য নিয়েই এথেন্স থেকে ম্যারাথন রওনা হলেন। তিনি জানতেন দারায়ুস ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছেন। তাঁর পক্ষে পারস্যবাহিনীর মুখোমুখি হওয়া

সম্ভব নয়। তাই তিনি ম্যারাথন থেকে এথেন্সের পথে এক দুর্ভেদ্য ও দুর্গম স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। এইসময় মিত্ররাষ্ট্র প্লেটিয়া থেকে এক হাজার সৈন্য এসে পৌঁছলেন। তাঁরাও গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য এথেনীয়দের সঙ্গে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন।

আকাশ ফাটানো চিৎকার করতে করতে পারস্যবাহিনী সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা এথেনীয়দের অবস্থান টের পেল না। কোন রকম সতর্ক না হয়েই সেই দুর্ভেদ্য স্থানে প্রবেশ করল। ওপর এবং দুপাশ থেকে ভীমবেগে এথেনীয়রা তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকলেন। তাঁরা প্রাণ পণ করে পারস্য সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। সাহসের কাছে শক্তি, দেশভক্তির কাছে হানাদারী, নির্ভীকতার কাছে কাপুরুষতা পরাজিত হল। হাজার হাজার পারসী সৈন্য মারা গেলেন। এবং সঙ্গীদের পরিণতি দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত পারসীরা পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন। কিন্তু ততক্ষণে মিলতিয়াদিস তাঁদের পালাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই ফাঁদে পড়ে আরও কয়েক হাজার পারসী সৈন্য মারা পড়লেন! তাঁরা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। আর তারপরেই স্পার্টার সৈন্যরা সেখানে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু তখন তাঁদের কিছুই করার ছিল না।

এই অবিশ্বাস্য জয়ের পরে এথেনীয়দের যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়ল, তেমনি এথেন্সের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। গ্রীক জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। আর সেই সঙ্গে প্রমাণিত হল যে পারস্যবাহিনী অজেয় নয়।

—আচ্ছা আঙ্কল. ওলিম্পিকে সবচেয়ে লম্বা দৌড়টাকে 'ম্যারাথন রেস' বলে কেন? সুপিন প্রশ্ন করে।

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। সুতরাং উত্তর দিই—জয়লাভের পরে মিলতিয়াদিস ফিজিপাইদিস নামে জনৈক গ্রীকসৈন্যকে বলেন, তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এথেন্সে গিয়ে সংবাদটি দাও।

ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। রণক্লান্ত ফিজিপাইদিস কিন্তু এক দৌড়ে এথেন্সে চলে গেলেন। তাঁরই

স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৮৯৬ সালে যখন এথেন্সে আধুনিক যুগের ওলিম্পিক উৎসবের প্রচলন হয়, তখন থেকেই 'ম্যারাথন রেস' নামে ২৬ মাইল ৩৮৫ ফুট দৌড় প্রতিযোগিতার প্রচলন করা হয়েছে।

—এবারে থার্মোপলির কথা বলো!

আমি থামতেই স্বপিন ফরমাশ করে। হেসে বলি—কিন্তু কটা বাজে খেয়াল আছে। হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না।

—তার এখনও অনেক দেরি। সবে তো এগারোটা বাজল। ঘড়ি দেখে স্বপিন বলে।

তার মানে, মেয়ে থার্মোপলির কথা না শুনে উঠবে না এখান থেকে। সুতরাং শুরু করি—ম্যারাথন যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে দারায়ুসের জেদ আরও বেড়ে গেল। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে, এথেন্সকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। অ্যাক্রো-পলিসে পারস্যের পতাকা তুলতেই হবে।

তিনি আবার অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু এবারেও ভাগ্য তাঁর বাদ সাধে। এথেন্স অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং প্রাণত্যাগ করেন।

পুত্র জারেকসিস (Xerrexes) সিংহাসনে বসলেন। তিনি ছিলেন 'বাপকা বেটা', সুতরাং সম্রাট হয়েই পিতার অসমাপ্ত আয়োজন শেষ করে ফেললেন।

খবর পেয়ে এথেন্স এবং স্পার্টা যুগ্মভাবে করিন্থে এক গ্রীকরাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বান করলেন। সম্মেলনে ত্রিশটি রাষ্ট্র পারস্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা করলেন। স্পার্টারাজ লিওনিদাস সম্মিলিত স্থল বাহিনীর এবং স্পার্টার সেনাপতি ইউরিবিয়াদিস নৌবাহিনী অধিনায়ক মনোনীত হলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০ সালে জারেকসিস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রীসের দিকে রওনা হলেন। নিজেদের সীমিত শক্তির কথা বিবেচনা করে

লিওনিদাস থার্মোপলির (Thermopylae) সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে পারস্যবাহিনীকে বাধা দেবার পরিকল্পনা করলেন। এই গিরিসঙ্কটের একদিকে মাউণ্ট ওইটা (Mt. Oeta) আরেকদিকে মহাসমুদ্র। সাগরের দিক থেকে যাতে পারস্য নৌবহর তাঁদের আক্রমণ না করতে পারে, তাই তিনি প্রথমেই গ্রীক নৌবহরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা গড়ে তুললেন। তারপরে লিওনিদাস মাত্র তিন শ' স্পার্টান ও সাত হাজার এথেনীয় সৈন্য নিয়ে থার্মোপলিতে অবরোধ গড়ে তুললেন। অবশেষে জারেকসিস তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে থার্মোপলির উপকণ্ঠে পৌঁছলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে গ্রাকবাহিনী তাঁর সৈন্যবল দেখে পালাতে শুরু করবেন। কিন্তু চারদিন দেরি করার পরে যখন দেখতে পেলেন যে গ্রীকরা তাঁদের ঘাটি ত্যাগ করছেন না, তখন তিনি তাঁদের আক্রমণ করলেন। অসীম সাহস ও উন্নত যুদ্ধকৌশলের সাহায্যে গ্রীকরা সে আক্রমণ প্রতিহত করলেন। পরদিন জারেকসিস আবার আক্রমণ করলেন, কিন্তু গ্রীক প্রতিরোধ ভাঙতে পারলেন না। তার পরদিনও কিন্তু গ্রীকবাহিনী অটল রইল। বার বার আক্রমণ করেও যখন কোন ফল হল না এবং যখন জারেকসিস জয়ের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, তখন এক অঘটন ঘটল। এফিয়ালতিস নামে একজন গ্রীক দেশদ্রোহী পারসিকদের একটি গোপন পথের খবর দিল। পারস্যবাহিনী পেছন থেকে গ্রীকদের আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলেন।

খবরটা লিওনিদাসের কানে এলো। তিনি বুঝতে পারলেন পরাজয় আসন্ন। তাই তাড়াতাড়ি অধিকাংশ গ্রীক সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বললেন। তারপরে নিজের তিন শ' স্পার্টান সৈন্য ও সামান্য কয়েক শ' এথেনীয় সৈন্য নিয়ে বিশাল পারস্যবাহিনীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে নিজেরা শহীদ হলেন।

পারস্যবাহিনী এথেন্স অধিকার করে অমানুষিক ধ্বংসলীলা চালালো। আর তাদের এই বর্বরতার হাত থেকে অ্যাক্রোপলিসও

রেহাই পেল না।

লিওনিদাস ও তাঁর সতীর্থদের দেশপ্রেম ও বীরত্ব সমস্ত গ্রীক-জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও আত্মসচেতন করে তুলল। তাঁরা থার্মোপলির পরাজয়কে মেনে নিলেন না। জলে ও স্থলে পারস্যবাহিনীকে আক্রমণ করে যেতে থাকলেন। অবশেষে স্যালামিসের নৌযুদ্ধে পারস্য নৌবহর সম্পূর্ণ পরাজিত হল। বাধ্য হয়ে অবশিষ্ট পারস্য সৈন্যদের নিয়ে জারেকসিস দেশে ফিরে গেলেন। এথেন্স মুক্ত হল। মুক্ত হল অ্যাক্রোপলিস। আর সেই সঙ্গে প্রমাণিত হল দেশপ্রেমের মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই লিওনিদাস ও থার্মোপলির অন্যান্য অমর শহীদদের।

স্যালামিসের নৌযুদ্ধ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিউরী (Bury) বলেছেন—'The victory of Salamis was a crushing blow to Persia's naval power'

নয়

এজেন্সী অফিস থেকে বাস ছাড়তে শেষ পর্যন্ত সাড়ে চারটে হয়ে গেল। কম তো নয় প্রায় পঞ্চাশজন ভিনদেশী নারী-পুরুষ। বিভিন্ন হোটেল থেকে নিয়ে এসে রওনা হওয়া। আজও শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাই বেশি। তবে কয়েকজন জাপানী ও মধ্যপ্রাচ্যের পর্যটক রয়েছেন। আর রয়েছি আমরা, আমি ও চন্দ্র ও সুপিন।

মিনিট বিশেকের মধ্যেই আমরা এথেন্স শহর ছাড়িয়ে এলাম। পৌঁছে গেলাম মহানগরীর উপকণ্ঠে, সাগরতীরে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত একখানি সুবিশাল রঙীনছবি। ডাইনে নীল সমুদ্র। বাসে বসে মনে হচ্ছে ভারী শান্ত। তার বুক জুড়ে পরম প্রশান্তি। তাই তো হবে। এটি যে গ্রীক-পুরাণের পরম পবিত্র জলধি।

সাগরতীরে কিন্তু বালুকাবেলা দেখছি না। অর্থাৎ আমরা সাগরসৈকত বলতে সাধারণত যেমন বুঝি, মোটেই তেমনটি নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় লালমাটি কালো পাহাড় আর সবুজ ঝোপঝাড়। তারই সীমান্তে সাগর। কোথাও মাটির কাছে, কোথাও ঝোপ-ঝাড়ের পাশে আবার কোথাওবা পাহাড়ের পদতলে।

সাগর থেকে উঠে এসে সৈকত যেখানে মোটামুটি সমতল হয়েছে, সেখান দিয়েই এই মসৃণ মোটরপথ, 'দি এথেন্স-সউনিয়ন রোড'। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। আমরা পুবের যাত্রী।

কিন্তু পথের কথা পরে হবে, আগে সাগরের কথা বলে নিই, স্যারোণিক গাল্‌ফ। দেখে নিই তার বিচিত্র-সুন্দর তীরভূমি। আমাদের বঙ্গোপসাগর কিম্বা আরব সাগরের মতো সরলরেখা কিম্বা ত্রিভুজাকৃতি নয় এ সাগরসৈকত। এটি একেবারেই বক্ররেখা। খানিকটা দূরে দূরেই লালমাটির পার ছুচলো হয়ে সাগরের বুকে গিয়ে বিঁধেছে, কিম্বা একটা ছোট পাহাড় তার বুকের ওপরে বসে আছে। নীলজল তাদের সঙ্গে জলকেলি করছে। এককথায় সারা সাগরসৈকত জুড়ে ছোট-বড় খাড়ি। খাড়ির ধারে মাঝে মাঝে মানুষ বাসা বেঁধেছে। লাল টালি দিয়ে ছাওয়া একতলা কিম্বা দোতলা ছোট-ছোট বাড়ি আর আশে পাশে কিছু বড়-বড় গাছ।

সাগর সুন্দর। কিন্তু তীরভূমির ভূ-প্রকৃতি তার চেয়েও সুন্দর। মাটি তো নয়, সবুজের ঢেউ। তারই ওপরে কোথায় কোথাও জেগে রয়েছে ছোট-ছোট পাহাড়।

শুধু সবুজ বলা বোধকরি ঠিক হল না। কারণ মাঝে মাঝেই বনফুলের সমারোহ। নানা রঙের ফুল। তারা সবুজের বুকে রামধনু এঁকে দিয়েছে। রামধনু শুধু মাটিতে নয়, আকাশে। সাগরের বুকেও রামধনুর খেলা চলেছে অবিরত। এমন সাগর সৈকত আর পথ খুব কমই দেখেছি।

কথাটা কেবল আমার পক্ষেই সত্য নয়। আমার সহযাত্রীরা অনেকেই এমন পথ পাড়ি দেন নি। তাই তারা সবাই প্রাণভরে

দেখে নিচ্ছেন, গ্রীসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করছেন। আর সুপিন? সে তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। মাঝে মাঝেই বলে উঠছে—Wonderful landscape···beautiful terrain···

আজও সুপিন সামনের সিটে চন্দ্রকে বসিয়েছে আর আমাকে নিয়েছে পাশে। কিন্তু গ্রীসের অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতি আজ ওকে এখনও গল্পের ফরমাশ করতে দেয় নি। আমি অবশ্য ভয়ে ভয়ে রয়েছি। কখন হুকুম করে বসবে কে জানে।

না। এবেলা বোধকরি সে আর গল্প বলার বায়না করার সুযোগ পেলো না। কারণ আমাদের প্রৌঢ়া গাইড হাতে মাইক নিয়েছেন। সবার সঙ্গে সুপিনও তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। গাইড শুরু করেন—লেডিজ এ্যাণ্ড্ জেণ্ট্‌লমেন, আমরা এখন সউনিয়ন চলেছি, দেখতে চলেছি বিশ্ববিখ্যাত পজিডন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।···

আমরা মাথা নাড়ি। ভারী সুন্দর উচ্চারণে ভদ্রমহিলা ইংরেজীতে বলে চলেন—আপনারা সবাই জানেন, গ্রীসের এই অঞ্চল অর্থাৎ এথেন্স যে অঞ্চলে অবস্থিত, তার নাম অ্যাটিকা (Attica) প্রদেশ। এই অ্যাটিকার 'Southernmost tip' বা দক্ষিণ-প্রান্তিক সংকীর্ণ পাহাড়ী ভূখণ্ড হচ্ছে সউনিয়ন। সাগরের শিয়রে একটি পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত এই ধ্বংসাবশেষ। স্যারোণিক উপসাগরের এই অংশের নাম 'The bay of Sounion.'

আজকের পৃথিবীতে খ্রীস্টপূর্ব যুগের যে সামান্য কয়েকটি দর্শনীয় স্মারক রয়েছে. সউনিয়নে পজিডন (Poseidon) মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, তাদের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'One of the most impressive clasical monuments to have survived to the present day.' এটি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি প্রথম নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য তখন এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসেও মন্দির নির্মাণের কাজ চলেছিল।

আপনারা সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারবেন যে ঐ রমণীয় স্থানে এখন যে মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে, সেটাই ওখনকার প্রথম

এবং একমাত্র মন্দির নয়। বুঝতে পারবেন, ঐ মন্দিরটি ছাড়া আরও মন্দির সেখানে নির্মিত হয়েছিল। পুরাতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন, ওখানে আরও অন্তত একটি বড় মন্দির ছিল।...

—সেটি কাঁর মন্দির ?

জনৈক পর্যটকের প্রশ্নে থামতে হয় ভদ্রমহিলাকে। তিনি উত্তর দেন—এথেনাদেবীর।

—এথেনা তো এথেন্সের ইষ্টদেবী। এখানে আবার তাঁর মন্দির হল কেন ?

—দেবী এথেনা বা এথেনী (Athene) কেবল এথেন্সের ইষ্টদেবী নন, তিনি গ্রীস ও রোমের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া পরমেশ্বরী। রোমানরা তাঁকে বলেন মিনার্ভা (Minerva) তিনি জ্ঞান এবং শক্তির সর্বেশ্বরী। তিনি দেবরাজ জিউস এবং মেতিসের (Metis) কন্যা। কথিত আছে, তাঁর জন্মের আগে ভবিষ্যদ্বাণী হয় যে এবারে দেবী মেতিসের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু এর পরে যদি মেতিসের আর কোন সন্তান হয়, তাহলে সে হবে পুত্র এবং সেই পুত্র পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। কথাটা কানে আসা মাত্র জিউস মেতিসকে গিলে খেয়ে নিলেন। কিছুদিন বাদে জিউসের অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। বাধ্য হয়ে তিনি একদিন বিশ্বকর্মা ভালকানকে তাঁর মাথার খুলি কেটে ব্যাপারটা দেখতে বললেন। আর খুলি কাটতেই একেবারে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে দেবী এথেনা ভূমিষ্ঠা হলেন।*

সুতরাং দেবী এথেনা দেবরাজদুহিতা। তিনি শিল্প এবং কলার অধিষ্ঠাত্রীদেবীও বটে। তিনি এদেশে অলিভগাছ নিয়ে আসেন।

—আর পজিডন ?

এবারে জিজ্ঞেস করে সুপিন। গাইড জবাব দেব—পজিডনদেব হলেন দেবরাজ জিউসের ভাই, ক্রোনোস (Cronos) ও রিয়াদেবীর (Rhea) ছেলে। তাঁর অপর নাম নেপচুন।

* "Pears' Encyclopaedia of Myths and Legends"

—তার মানে পজিডনদেব এথেনাদেবীর কাকা ?

গাইড মাথা নাড়েন। বলতে থাকেন—পজিডনদেবকে প্রথমে নদী ও ঝরণার দেবতা রূপে পুজো করা হত। পরে তিনি সাগরদেবতা রূপে স্বীকৃত হন। তিনি অলিম্পিক প্যানথিয়নের প্রধান দ্বাদশ দেবতার অন্যতম। আগে তিনি গভীর সমুদ্রে বাস করতেন। পরে অলিম্পাসে এসে বসবাস করতে থাকেন।

—অলিম্পাসের অন্যান্য প্রধান দেব-দেবীদের কথা একটু বলুন !

—দেবরাজ জিউস ও তাঁর দু-ভাই হাদিস (Hades) বা প্লুটো ও পজিডন। হাদিস হলেন পাতাল বা মৃত্যুরাজ্যের দেবতা। অন্যান্য প্রধান দেবীরা হলেন—জিউসের তিন বোন অগ্নিদেবী হেস্তিয়া (Hestia), কৃষিদেবী দিমিতার (Demeter) ও হেরা বা জুনোদেবী।···

—জুনোদেবী তো দেবরাজ জিউসের প্রধানা মহিষী !

—হ্যাঁ। দেবরাজ বোনকেই বিয়ে করেছেন।

একবার থামেন গাইড। তারপরে আবার বলতে থাকেন—অলিম্পাসের অন্যান্য প্রধান দেব-দেবী হলেন, অনন্তযৌবনা ভিনাস, রণদেবতা মার্স, দেবদূত মার্কারী, বিশ্বকর্মা ভালকান, অ্যাপোলোদেব ও দেবী এথেনা প্রভৃতি।

—তা খুড়ো-ভাইঝি, অর্থাৎ পজিডন ও এথেনার সম্পর্কটা কি রকম ছিল ?

—প্রথমদিকে মোটেই ভাল ছিল না। একাধিকবার দুজনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু পরে মিটমাট হয়ে যায়। সউনিয়নে দুজনে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করেছেন। সেখানে দুটি মন্দিরের দূরত্ব ছিল মাত্র শ' পাঁচেক মিটার। এখন এথেনার মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাহলেও আপনারা সেখানে গিয়ে মন্দিরের জায়গাটা বুঝতে পারবেন। সেইসঙ্গে দেখবেন যে ঐ রমণীয় স্থানের সবচেয়ে ভাল জায়গাটিতেই পজিডন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। সেকালে প্রতি চারবছর অন্তর ঐ মন্দিরে একটি মহোৎসব হত। তখন

রাজকর্মচারীদের নিয়ে স্বয়ং রাজা জাহাজে করে সউনিয়ন আসতেন।

—জলপথে এথেন্স থেকে সউনিয়নের দূরত্ব কত?

—এথেন্স নয়, পাইরিউস। সউনিয়ন পাইরিউস বন্দরের ৩১ নটিক্যাল (Nautical) মাইল দক্ষিণ-পুবে অবস্থিত।

—আর স্থলপথে?

—এথেন্স থেকে সউনিয়ন যাবার দুটি মোটরপথ। একটি এই নবনির্মিত সাগরসৈকতের পথ। এটির দূরত্ব ৬৭ কিলোমিটার। আর গ্রামের ভেতর দিয়ে সেকালে যে পুরনো পথটি ছিল, সেটিরও সংস্কার সাধন করে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। সে পথের দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার।

একবার একটু থেমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন গাইড। বলতে থাকেন—আপনারা বহুদূর থেকেই পজিডন মন্দিরের সেই স্তম্ভগুলি দেখতে পাবেন। তখুনি মন্দিরের অপূর্ব অবস্থানটি বুঝতে পারবেন। দেখবেন সেখানে তীরভূমি সমুদ্রের বেশ খানিকটা ভেতরে প্রবেশ করেছে আর তারই শেষপ্রান্তে একটি প্রায় সমতল টিলা। এ অঞ্চলের উচ্চতম স্থান এবং সেখানেই মন্দির। সুতরাং সেকালে মন্দিরটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এখন কেবল কয়েকটি স্তম্ভ কিন্তু আপনারা স্পষ্ট দেখতে পাবেন সেকালের মন্দিরের মতো একালে তার ধ্বংসাবশেষও সারা অঞ্চলের ওপর প্রভুত্ব করে চলেছে।

মন্দিরের ইতিহাসও একই কথা বলে। প্রায় প্রতিদিন পুণ্যার্থীরা দলে দলে এখানে আসতেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অথবা পথের দূরত্ব ও দুর্গমতা তাঁদের নিরুৎসাহিত করতে পারত না। কেউ দস্যুর হাতে মারা পড়তেন, কেউ হিংস্র শ্বাপদের শিকার হতেন, কেউবা পথকষ্টে প্রাণ হারাতেন। তবু পুণ্যার্থীরা পশ্চাৎপদ হতেন না।...

গাইডের কথা শুনে আমি মোটেই বিস্মিত হতে পারছি না। কারণ এমন ঘটনা তো আজও ঘটে চলেছে। হিমালয়ের দূর-দুর্গম তীর্থপথের বাঁকে বাঁকে কত অসংখ্য প্রাণ বলি হয়েছে। কিন্তু তাতে কি পুণ্যার্থীর সংখ্যা কিছুমাত্র কমেছে?

তার মানে সেই কথাটি আবার মনে পড়ছে। ভাষা ধর্ম সংস্কার আর দূরত্বের সকল ব্যাবধান সত্বেও দেশে দেশে মানুষের মাঝে একটা বিস্ময়কর ভাবগত ঐক্য সেই সুদূর অতীত থেকেই বিদ্যমান ছিল। এবং জগতের শত পরিবর্তনের মাঝেও মানুষের ভালোবাসা আর ভক্তির কোন পরিবর্তন হয় নি।

কিন্তু থাক্ গে আমার ভাবনা। তার চেয়ে গাইডের কথা শোনা থাক। এখন তিনি সউনিয়নের ইতিহাস বলছেন—

এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই যে সউনিয়ন অঞ্চলের মনুষ্যবসতি অতিশয় প্রাচীন। কারণ এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বেশ কয়েকটি কবর পাওয়া গেছে, যাদের সবচেয়ে পুরোনোটি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের। অবশ্য লিখিত ভাবে আমরা সউনিয়নের প্রথম উল্লেখ পাই মহাকবি হোমার রচিত 'ওদিসি' মহাকাব্যে। সেখানেও হোমার 'Sanctuary' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বলেছেন '…but when we came to the Sanctuary of Sounion…' (Odys. III, 278.)

অতএব খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকেও সউনিয়ন বেশ বিখ্যাত ছিল। আর সে খ্যাতির মূলে মন্দির ও বন্দর। কারণ ট্রয়নগরী থেকে হেলেনকে উদ্ধার করে মেনেলাস জাহাজে করে সউনিয়ন বন্দরে আসেন। আসার পথে তাঁর নাবিক ফ্রন্তিস (Phrontis) মারা যায়। তাঁকে এখানে কবর দিয়ে মেনেলাস হেলেনকে নিয়ে ম্যাক্রো-নিসস (Macronisos) দ্বীপে অর্থাৎ Island of Hellen-এ চলে যান।

সউনিয়ন সুপ্রাচীন তীর্থস্থান হলেও খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ওখানে কাঠের মন্দিরে দারুবিগ্রহ রূপে বিরাজ করতেন।

থার্মোপলি যুদ্ধের পরে পারস্যবাহিনী সাময়িক ভাবে অ্যাটিকা অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। তারা অ্যাক্রোপলিসের মতো সউ-নিয়নেও ধ্বংসলীলা চালায়। ফলে মন্দিরদুটি খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সালামিসে যুদ্ধজয়ের পরে তাই একটি ধৃত পারস্য যুদ্ধজাহাজকে

পজিডনদেবের ভেটস্বরূপ সউনিয়নে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এথেনীয়রা বিশ্বাস করতেন পজিডন দেবের কৃপাতেই তাঁদের সালামিসের যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে।

একবার থামেন গাইড। আর সেই সুযোগে জনৈক প্রৌঢ় পর্যটক প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, মন্দিরদুটি বলতে আপনি কোন্-কোন্ মন্দির বোঝাতে চাইছেন?

—পজিডনদেবের মন্দির আর দেবী এথেনার মন্দির। এথেনা মন্দির ছিল নিতান্তই স্থানীয়তীর্থ কিন্তু পজিডন মন্দিরটি সেকালের শক্তিশালী এথেন্স রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয় রূপে স্বীকৃত ছিল।

পর্যটক গাইডকে ধন্যবাদ জানান। গাইড আবার বলতে শুরু করেন—পারস্য যুদ্ধের ফলে গ্রীসের, বিশেষ করে এথেন্স রাষ্ট্রের জনজীবন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়। এই সময়ে এথেন্স রাজ্যের লরিয়ন (Laurion) নামে একটা জায়গায় রূপার খনি আবিষ্কৃত হয়। রাষ্ট্রনেতাগণ স্থির করেন রুপোর আয় থেকে যুদ্ধজাহাজ তৈরি করা হবে। এথেন্স গ্রীকের জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্যও চেষ্টা শুরু করে। খ্রীস্টপূর্ব ৪৭৮ সালে অর্থাৎ থার্মোপলি যুদ্ধের দু'বছরের মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ নিয়ে এথেন্স Delian Confederacy নামে এক মিত্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ঈজিয়ান উপসাগরীয় বাণিজ্যের সিংহভাগই তার হাতে চলে আসে। এবং এথেন্স দেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এথেন্সকে অহঙ্কারী ও সাম্রাজ্যবাদী করে তোলে। যারা মিত্র হিসেবে মিত্রসংঘে যোগ দিয়েছিল, এথেন্স তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে শুরু করে। এরই পরিণতিতে বিপদের বন্ধু স্পার্টার সঙ্গে সাতাশ বছর ব্যাপী (খ্রীঃ পূঃ ৪৩১-৪০৪) পেলোপনেসিয়ান (Peloponnesian) যুদ্ধ। কিন্তু সেকথায় পরে আসছি। তার আগে অন্য একটি কথা বলে নিই।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ওপরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আরও একটি কারণ ছিল। কারণ এইযুগে এথেন্সে বেশ কয়েকজন অতিশয় মেধাবী

মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। আর তাই সেই সময়কে আজও 'Greatest days of Athens' বলা হয়।

এই সময়েই অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ৪৪৪ থেকে ৪৪০ অব্দের মধ্যে সউনিয়নে নতুন পজিডন মন্দির নির্মিত হয়। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্থপতিদের দিয়ে সেই সুবিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল।

দুঃখের কথা মন্দিরটি তৈরি হবার দশবছরের মধ্যেই পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধে এথেন্স সউনিয়নকে নৌযুদ্ধ জাহাজের ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, তখন এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গও তৈরি করা হয়।...

—কিন্তু বন্দর তো সউনিয়নে আগেও ছিল। নইলে ট্রয় থেকে ফিরে আসার পথে হেলেন এখানে অবতরণ করবেন কেন? সুপিন জিজ্ঞেস করে।

একটু হেসে গাইড জবাব দেন—ছিল বৈকি এবং তা পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের পরেও। কারণ তখন এথেন্সে পৌঁছবার আগে অথবা এথেন্স থেকে রওনা হবার পরে যদি হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ত, তাহলে জাহাজগুলি সউনিয়নে এসে আশ্রয় নিয়ে ভাল আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত। দার্শনিক প্লাতোর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি এই একই কারণে সুমহান সক্রেতিসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে নাকি দেরি হয়ে যায়।

—এক্সকিউজ মী! সক্রেতিসের সময়টা?

একটু ভেবে গাইড উত্তর দেন—খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৯ থেকে ৩৯৯ সাল।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

গাইড আবার শুরু করেন—পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ফলে এথেন্স এবং স্পার্টা দুটি রাষ্ট্রই দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং পরবর্তী শতকেও এথেন্স সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাতে সউনিয়নের উন্নতি ব্যাহত হয় নি। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধেও সউনিয়ন অ্যাটিকা প্রদেশের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ও ব্যস্ত বন্দর।

খ্রীস্টপূর্ব ২৬৭ সালে মাসিদনের সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ বেঁধে যায়।...

—মাসিদন মানে আলেকজান্দার দা গ্রেট? জনৈকা পর্যটক প্রশ্ন করেন।

গাইড মাথা নাড়েন।

সুপিন বলে ওঠে—এক্সকিউজ মী! আলেকজান্দারের সময়টা?

—খ্রীস্টপূর্ব ৩৫৬ থেকে ৩২৩ সাল।

—ধন্যবাদ।

মৃদু হেসে গাইড আবার বলতে শুরু করেন—মাসিদনের সঙ্গে যুদ্ধে স্পার্টা ও মিশর এথেন্সকে সাহায্য করে। তা সত্ত্বেও খ্রীস্টপূর্ব ২৬১ সালে মাসিদন এথেন্স দখল করে নেয় এবং খ্রীস্টপূর্ব ২২৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বত্রিশ বছর ধরে এথেন্সকে সেই পরাধীনতার জ্বালা সইতে হয়।

সম্ভবত এইসময় থেকেই সউনিয়নের পতন শুরু। কারণ রোমসম্রাট অগাস্টাস সীজার যখন এখানে আসেন তখন সউনিয়নের দুর্দশা চলেছে। সম্রাট তাই জরাজীর্ণ মন্দির থেকে দেবী এথেনার বিগ্রহটি নিয়ে যান। আপনারা আশাকরি জানেন যে অগাস্টাস সীজারের জীবনকাল হল খ্রীস্টপূর্ব ৩১ থেকে খ্রীস্টীয় ১৪ সাল।

সুপিন মাথা নাড়ে। এবারে গাইড আর তাকে সময় জিজ্ঞেস করার সুযোগ দিলেন না। তিনি বলে চলেন—খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি লরিয়ান রুপোর খনির হাজারখানেক ক্রীতদাস কর্মী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁরা সউনিয়ন দখল করে নেন। সম্ভবত তখন মন্দির দুর্গ ও বন্দর সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরবর্তীকালের গ্রীক ইতিহাস সউনিয়নের ওপরে তেমন কোন আলোকপাত করে নি। কেবল জানা যায় খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সউনিয়ন এবং ম্যাক্রোনিস্‌স জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। ফলে সউনিয়ন অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়।

সপ্তদশ শতকে কয়েকজন বেপরোয়া পর্যটক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও অমানুষিক পথকষ্ট সহ্য করে এই সুপ্রাচীন তীর্থদর্শনে আসেন।

তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায়। তখন দেবী এথেনার মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং পজিডন মন্দিরের চোদ্দটি স্তম্ভ কোন মতে দাঁড়িয়েছিল। তার মধ্যে ন'টি দক্ষিণদিকে আর পাঁচটি উত্তরে এখনও সেগুলি রয়েছে। আপনারা দেখতে পাবেন। সেইসঙ্গে আরও দুটি স্তম্ভ দেখবেন। পর্যটকগণ কেন সেদুটির উল্লেখ করেন নি বলতে পারব না।

থামলেন গাইড। তাঁর দিকে তাকাই। সউনিয়নের ইতিহাস কি শেষ হয়ে গেল?

না। গাইড আবার বলতে শুরু করেছেন—রোমান্টিক ইংরেজ কবি ও আমাদের পরমপ্রিয় জাতীয়কবি লর্ড বায়রণ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রীস ভ্রমণ করেন। তখন তিনি সউনিয়নে এসেছেন। বায়রণ পজিডন মন্দিরের স্তম্ভগুলি দর্শন করে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন! স্তম্ভগুলিকে তিনি 'Marbled steep' বলে বর্ণনা করেছেন। কবি বায়রণ গ্রীক সভ্যতার ঐতিহাসিক স্মারকসমূহ সংরক্ষণের জন্য মানবজাতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর 'Childe Harold's Pilgrimage' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন…

একটু থামেন গাইড। তারপরে সুললিত স্বরে আবৃত্তি করেন—

'Save where some solitary Column mourns
Above its prostrate brethren of the cave;
Save where Tritonia's airy shrine adorns
Colonna's cliff, and gleams along the wave;
Save O'er some warriors' half-forgotten grave;
Where the grey stones and unmolested grass
Ages, but not oblivion, feebly brave,
While strangers only not regardlless pass,
Lingering like me, perchance, to gaze and sigh
Alas !'

ইংরেজ কবির সেই আবেদনে গ্রীসের মানুষ সাড়া দিয়েছেন এবং

আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পরামর্শ মেনে চলেছেন। আর আমরা? ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ আমাদের দেশে যেসব নিদর্শন আবিষ্কার করে গিয়েছেন, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা পর্যন্ত করে উঠতে পারি নি।

দশ

সাগরের তীরে তীরে এই রমণীয় মোটরপথটির নাম এথেন্স-সউনিয়ন রোড। কিন্তু সউনিয়ন পৌঁছে পথটি ফুরিয়ে যায় নি। উত্তর-পূর্বমুখী হয়ে লরিয়ন চলে গেছে। আমাদের বাস সেদিকে না এগিয়ে আরেকটি বাঁধানো পথ ধরে এই সউনিয়ন অন্তরীপে প্রবেশ করেছে। প্রায় সমকোণী চতুর্ভুজের আকারে পাথর মাটি আর বালির অন্তরীপ। সমতল পথ থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। তিনদিকেই সাগর। একদিকের একটুখানি অংশ কেবল মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। অন্তরীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় সাগরের কোলে পজিডন মন্দির।

না। মন্দির পর্যন্ত বাস উঠতে পারল না। পথ নেই। চড়াই পথে খানিকটা উঠেই, অনেকখানি বাঁধানো জায়গা, কার-পার্ক। সেখানেই মোটর পথ ফুরিয়ে গেল। বাস থেকে নামতে হল। এথেন্স থেকে রিজার্ভড বাসে এখানে আসতে দেড়ঘণ্টা লাগল। শুনেছি লাইনের বাসে আসতে দু-ঘণ্টা লাগে। এবং সারাদিন সে বাস চলাচল করে।

কার-পার্ক ছাড়িয়েই একটি পাথর বাঁধানো পায়েচলা চড়াই পথ। আমরা সেইপথে ওপরে উঠতে থাকি।

জায়গাটা অন্তরীপ হলেও মালভূমির মতো। সাগরপারে দক্ষিণ-পূর্ব অংশটাই বেশি উঁচু। সেখানেই পজিডন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পজিডনের উত্তরপুবে অনেকখানি এলাকা জুড়ে মাটির ওপরে মিটার-

খানেক উঁচু পাথরের দেওয়াল, চৌকো ঘেরা। বুঝতে পারছি, কোনকালে এখানে বড় বাড়ি ছিল। গাইড বলেন—এথেনা মন্দিরের ভিৎ।

আমি দেখি। অনেকটা নালন্দা বৌদ্ধ-বিহার ধ্বংসাবশেষের মতো।

চলতে চলতে সুপিন প্রশ্ন করে—দুর্গটা কোনখানে ছিল?

—পজিডন মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিমের পুরো এলাকা নিয়ে। ওদিকে পাহাড়টা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে সাগরপারে গিয়ে শেষ হয়েছে। সাগর থেকে দুর্গে উঠে আসার বেশ প্রশস্ত পথ ছিল। নৌঘাঁটিও ছিল সেখানেই। এখনও মন্দির থেকে ওখানে নোঙ্গর করা জাহাজ দেখতে পাবেন। আপনারা জানেন যে অবস্থানের জন্য এই অন্তরীপটি সেকালে ওয়াচ-টাওয়ার' বা প্রহরাচৌকির কাজ করত। কারণ এখান থেকে স্যারোনিক উপসাগরের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। আপনারাও দেখতে পাবেন।

আমরা সারি বেঁধে চড়াই ভাঙছি। মাটি আর পাথুরে প্রান্তর পথের পাশে ঘাস ও ঝোপঝাড়। কোথাও কোথাও বুনোফুল। লাল ও হলুদই বেশি, সাদা আর বেগুনীও কিছু রয়েছে। প্রান্তরের এখানে-ওখানে প্রচুর বড় বড় পাথর পড়ে আছে। পাহাড়ী পাথর নয়। কোনটি গোল, কোনটি চৌকো আবার কোনটিবা অন্য আকারের। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা মানুষের হাতের পরশ পেয়েছে। মানুষ ঘষে-মেজে এগুলি দিয়ে দেবালয় তৈরি করেছিল আবার মানুষই তা ধ্বংস করেছে। তাই এখন এরা এমন অনাদরে পড়ে আছে চারিদিকে।

গাইড আবার বলেন—কেবল মন্দির, দুর্গ আর বন্দরের জন্যই সউনিয়নের খ্যাতি ছিল না। এখানের বেলাভূমিও চমৎকার। অনেকে বলেন দেশের সবচেয়ে সুন্দর সৈকত। তাই মন্দিরে দাঁড়িয়ে আপনারা সাগরপারে স্নানার্থীদের ভিড় দেখতে পাবেন। তবে অত উঁচু থেকে মানুষগুলোকে লিলিপুটের মতো মনে হবে।

—সাগর থেকে মন্দির কত উঁচু? জনৈকা সহযাত্রী প্রশ্ন করেন।

—সমুদ্র সমতা থেকে ঐ মন্দিরের উচ্চতা ৭৩ মিটার।

লাল মাটির ওপরে বেশ বড় বড় পাথরের টালি বিছিয়ে পথ। সেই পথ বেয়ে মালভূমি সদৃশ পাহাড়টার প্রায় ওপরে উঠে এসেছি। এখন সামনে শুধু ধাপ বিশেক সিঁড়ি। হালে তৈরি। পর্যটকদের প্রয়োজনে। সেটি পার হলেই আমরা পজিডন মন্দিরের সামনে পৌঁছে যাবো।

পৌঁছে গেলাম মন্দিরের উত্তর আঙ্গিনায়। বাঁয়ে মন্দির আর ডাইনে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। না দুর্গের কোন দেওয়াল কিম্বা স্তম্ভ অবশিষ্ট নেই। কেবল কোন কোন জায়গায় ভিতটুকু রয়েছে। আর ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথর। তবু গাইড হাত দেখিয়ে বলেন—'The temple of Poseidon and the fortresss of Cape Sounion'.

আরেকবার দেখে নিই চারিদিকে। গাইড ঠিকই বলেছেন। তিনদিকেই জল, The bay of Sounion, সউনিয়ন উপসাগরের উপকণ্ঠে সউনিয়ন অন্তরীপ। তবে উপসাগরের নামে অন্তরীপ, না অন্তরীপের নামে উপসাগর সেকথা জানালেন না গাইড।

আমাদের বাঁদিকে মন্দির অর্থাৎ পজিডন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। চারিদিকে পাথর বাঁধিয়ে উঁচু ভিত, সুবিশাল এলাকা জুড়ে, আয়তক্ষেত্রাকার এটি মন্দিরের প্রথম স্তর। এর প্রায় মাঝখানে তেমনি আয়তক্ষেত্রাকার দ্বিতীয় স্তর। তারই ওপরে সেই বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন মন্দিরের স্তম্ভরাজি।

আমরা কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে প্রথম স্তরে উঠে এলাম। এটি বোধকরি মন্দিরের চাতাল ছিল। চারিদিকেই প্রশস্ত চাতাল। এখান থেকে আবার কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে মূল-মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছতে হবে। কিন্তু তার বোধকরি কিছু দেরি আছে। কারণ গাইড চাতালের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আমরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াই। তিনি বলেন—বলা বাহুল্য আপনারা এখানে ও চারি-দিকে যেসব ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছেন। তা প্রায় সবই পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়েছে।

—কোন্ সময়ে সেই খননকার্য শুরু হয়েছিল? জনৈক জাপানী পর্যটক প্রশ্ন করেন।

সুপিন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে—আঙ্কল, এই ভদ্রলোকও মনে হচ্ছে লেখক, তোমার মতো।

—কেমন করে বুঝলে?

—দেখছ না, হাতে নোটবই ও কলম রয়েছে।

একটু হেসে বলি—আর তাই ভদ্রলোক লেখক নন। কারণ লেখকরা এসব নোট করেন না তাঁরা বই পড়ে জেনে নেন।

—তাহলে উনি কি হবেন?

—কেমন করে বলি? তবে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক একজন মনযোগী পর্যটক, এমনিই এসব লিখে রাখছেন। যাক্ গে, এসো এবারে গাইডের কথা শোনা যাক।

গাইড বলছেন—এখানে, বিশেষ করে এই পজিডন মন্দিরে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অষ্টাদশ শতকে শেষদিকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে অনুসন্ধান ঠিক উল্লেখ করবার মতো নয়। এখানে প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান শুরু করেন এক ফরাসী মিশন, ১৮২৫ সালে। তবে তাঁরা খুব সফলকাম নন। এর প্রায় ষাট বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে আসেন এক জর্মন পুরাতাত্ত্বিক দল। তাঁদের কাজে উৎসাহিত হয়ে গ্রীক আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা ১৮৯৭ সালে খননকার্য শুরু করেন। এবং একটানা ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কাজ করে সউনিয়নকে দর্শনীয় করে তোলেন।

একবার থামেন গাইড। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি ইসারা করে আবার বলতে শুরু করেন—এখন ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত যে এখান থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে ঐ সাগরপারে ছিল এথেনা মন্দির, তার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল জনপদ। আর অন্তরীপের অপরপারে অর্থাৎ দক্ষিণ সাগর তীরে ছিল বন্দর। ভাবলে রোমাঞ্চিত হতে হয় যে সুন্দরী হেলেন একদিন ট্রয় থেকে এই বন্দরে ফিরে এসেছেন এবং এখান থেকেই ঘরে ফিরে গিয়েছেন।

—আর দুর্গ মানে সেনানিবাস ইত্যাদি? জনৈকা আমেরিকান পর্যটক প্রশ্ন করেন।

গাইড আবার হাত দেখিয়ে বলেন—এই পজিডন মন্দিরের থেকে শুরু করে দক্ষিণে সাগর তীর পর্যন্ত ছিল সুরক্ষিত দুর্গ ও নৌঘাঁটি। পজিডন মন্দিরটি প্রকৃত পক্ষে দুর্গ প্রাকারের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। আর নৌঘাঁটিতে যাওয়া-আসার পথ ছিল দুর্গের ভেতর দিয়ে। আরেকটা কথা…

একটু থামেন গাইড। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন—এখন এই অন্তরীপে আপনারা ঘাস আর ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তখন এখানে দুটি মন্দিরেই ছিল ফুলের বাগান আর প্রায় সারা এলাকা জুড়েই ছিল বহু বড় বড় গাছ। বিশেষ করে এথেনা মন্দির, জনপদ ও বন্দর এলাকা তো রীতিমত ছায়াশীতল ছিল।

আমার মানসলোকে সেই সমৃদ্ধ সউনিয়নের কর্মব্যস্ত জনবহুল রূপটি ভেসে ওঠে। জাহাজের যাওয়া-আসা, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, বাসিন্দাদের ছুটোছুটি আর তীর্থযাত্রীদের আগমনে সর্বদা ব্যস্ত হয়ে থাকত সউনিয়ন। তখন নিশ্চয়ই এই সারা অন্তরীপ জুড়েই বহু যাতায়াতের পথ ছিল। মোটরপথ নয়, ঘোড়া ও ঘোড়ার-গাড়ির। সেই পথের ধূলিতে ধূসারিত হত পথচারীদের পোশাক। আর মন্দিরের নওবতখানা থেকে ভেসে আসত সানাই জাতীয় কোন বাঁশির সুর।…

ভাবনা থামাতে হয় আমাকে। গাইড হাঁটতে শুরু করেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গী হই।

কিন্তু একটু বাদেই গাইড আবার দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন—যে জায়গাটি দিয়ে আমরা এই মন্দির এলাকায় এসেছি, ওখানে দুটি উঁচু টাওয়ার ছিল। দিনরাত সেখানে লোক থাকত। তাঁরা সাগরে কিম্বা মাটিতে শত্রুর আগমন লক্ষ্য করত।

আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে অন্তরীপের এই অংশটা

একটা পাহাড়। পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল করে মন্দির ও দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল।

আমরা মাথা নাড়ি। গাইড বলতে থাকেন—পজিডন মন্দিরে এই স্তম্ভগুলি দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এর নির্মাণকৌশল অবিকল পার্থেনন মন্দিরের মতো। এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ একই স্থপতি মন্দির দুটি নির্মাণ করেছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব ৪৪৭ সালে অর্থাৎ পার্থেনন মন্দিরের দু-বছর আগেই এর নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হয়। তাই পার্থেননের স্তম্ভগুলির সঙ্গে এই স্তম্ভগুলির এমন সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। তবে দুটি মন্দিরের অঙ্গসজ্জার মাঝে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। এখানে 'ফ্রীজ' বা মূর্তিমালা ও কারুকার্য সবই ভেতরে, বাইরে কিছুই নেই।

আমরা দেখি। গাইড ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা তিনি বলেন নি। এখানে মূর্তিগুলো সবই একসঙ্গে। একটি কাহিনীর পরেই আরেকটি। মাঝখানে কোন যতি নেই।

গাইড কয়েকটি মূর্তিমালার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ইসারা করে বলেন—Gigantomacy দেবাসুরের সংগ্রাম; Centauromacy দেবতাদের সঙ্গে সেন্টরদের সংগ্রাম: থেসিউসের বিভিন্ন বীরত্ব···

—আঙ্কল, তুমি কিন্তু আমাকে থেসিউসের গল্প ব'লো নি এখনো। মাঝখানে হঠাৎ সুপিন বলে ওঠে। তার কণ্ঠে অভিমান।

তাড়াতাড়ি জবাবদিহি করি—হ্যাঁ। এখনও বলা হয়ে ওঠে নি। গল্পটা বড় তো, অনেকটা সময় দরকার। বলব একদিন। এখন এসো, আমরা গাইডের কথা শুনি।

গাইড বলছেন—মূর্তিমালা সবই মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। কিন্তু ভাল মার্বেল না হওয়ায় সমুদ্রের নোনা ও জলীয় আবহাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

স্তম্ভগুলি কিন্তু কোনটাই মার্বেল পাথরের নয়, সবই বেলে-পাথর জাতীয় পাথর দিয়ে তৈরি। এঁরা বলেন 'Porous stone'

বা সচ্ছিদ্র পাথর। যাক্ গে গাইডের কথা শোনা যাক।

গাইড বলছেন—অনেকের মতে খরচ কমাবার জন্যই দু-রকম পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার কারও মতে, প্রথমে সবই সচ্ছিদ্র পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। তার পরে পারস্য-সৈন্যরা এই মন্দিরের খুবই ক্ষতি করে। পরবর্তী কালে সংস্কার সাধন করার সময় মার্বেল পাথরের মূর্তিমালা এবং বহু রঙিন চিত্র দিয়ে মন্দিরটিকে ঐশ্বর্যশালী ও রমণীয় করে তোলা হয়।

একটু থেমে গাইড আবার বলে চলেন—আমি বোধ হয় আপনাদের বলেছি যে প্রথমে পজিডন এবং এথেনা দুটি মন্দিরই কাঠের বাড়ি ছিল। তখন দারু বিগ্রহ পূজিত হতেন। তারপরে ম্যারাথন যুদ্ধের (খ্রীঃ পূঃ ৪৯০) পরে এখানে প্রথম পাথরের মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু থার্মোপলি যুদ্ধের (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০) আগে নির্মাণকার্য শেষ হয় না। পারসী সেনারা সেই অসম্পূর্ণ মন্দিরেই ধ্বংসলীলা চালায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর মন্দিরটি সেভাবেই পড়ে থাকে। অবশেষে খ্রীস্টপূর্ব ৪৪৭ থেকে ৪৪০ সালের মাঝে কোনসময়ে নবকলেবরে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। যুগে যুগে সে মন্দিরের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এখন আমরা তারই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছি।

আজ এখানে আপনারা কেবল কয়েকটি স্তম্ভ আর তাদের ওপরে কিছু কারুকার্যখচিত পাথরের কড়িকাঠ শুধু দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এককালে এটি বিশ্বের একটি সবচেয়ে সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালী দেবালয় ছিল। আর অবস্থানের কথা কীইবা বলব! সে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে দাঁড়িয়ে সদাকম্পমান উজ্জ্বল সাগরের বুকে জেগে থাকা দ্বীপগুলিকে, চারিদিকের সাগর মাটি পাহাড় ও বনভূমিকে স্বপ্নের জগৎ বলে মনে হয়। আর সেকালে সুনীল-সাগরে বিধৌত অপরূপা মন্দিরটিকে মনে হত স্বর্গের অমরাবতী।

কিন্তু নিষ্ঠুরমানুষ আর মহাকালের কবলে পড়ে সভ্যতার কত সহস্র সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে! অতএব সেকালের মন্দিরের জন্য শোক না করে আসুন, আমরা একালের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করি।

যতটুকু আছে ততটুকু দেখেই আমাদের তৃষিত অন্তরে কিঞ্চিৎ বারি সিঞ্চন করি।

আমরা রয়েছি মন্দিরের উত্তর চাতালে। এদিকে একটি গোল ও দুটি চৌকো স্তম্ভ রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমাদের বাঁয়ে অর্থাৎ পুবে ন'টি আর ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে ছ'টি প্রায় অক্ষত স্তম্ভ সারি বেঁধে রয়েছে দাঁড়িয়ে। এছাড়া পশ্চিমে একটি স্তম্ভের গোড়ার দিকের খানিকটা অংশও রয়ে গেছে। কিন্তু আর দুটি স্তম্ভ ও দক্ষিণের স্তম্ভগুলির কোন চিহ্ন নেই। তাহলেও মন্দিরটি যে আয়তক্ষেত্রাকার ছিল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

চৌকো স্তম্ভ বলতে কিন্তু কেবল উত্তরদিকের দুটি, বাকি সবই গোলাকার। দুটি চৌকো স্তম্ভের ডানদিকেরটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন গাইড। তারপরে বলতে শুরু করেন—বহু বছর আগের থেকেই পর্যটকরা এই মন্দিরগাত্রে নাম খোদাই করে নিজেদের অমর করে তুলতে চেয়েছেন। আর সেজন্য তাঁরা বেছে নিয়েছেন এই দুটি চৌকো থাম। গোল থামগুলোর ওপরে নাম খোদানো কষ্টকর। কাজটা ভাল নয়। এতে ঐতিহাসিক নিদর্শনের মূল্য কমে যায়। কিন্তু আমরা উৎসাহী মানুষগুলোকে ক্ষমা করে দেব। কারণ এঁদের মধ্যে একজন হলেন গ্রীসের পরমহিতৈষী ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণ। এই দেখুন, এখানে তিনি নাম খোদাই করে গিয়েছেন ··

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। কে আগে দেখবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। য়ুরোপে আসার পর থেকে এ জিনিসটা প্রায় দেখি নি বলা চলে। আমি সব জায়গাতেই এমনি বাসট্যুর করেছি এবং আমার সঙ্গে আজও মোটামুটি একই রকম পর্যটকমণ্ডলী। কি জানি মহাকবি বায়রণ হয়তো আমার সহযাত্রীদের এমন অসহিষ্ণু করে তুলেছেন।

আমি কেবল ভারতীয় পর্যটক নই, আমি বরিশালের বাঙ্গাল। ধাক্কাধাক্কিতে এঁরা কেউ আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না। তবু আমি এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারি না। সহসা সুপিন একখানি

হাত ধরে আমাকে ভিড়ের বাইরে নিয়ে আসে। সকরুণ স্বরে বলে— আঙ্কল তোমার বয়স হয়েছে। প্লীজ ওয়েট। ওদের দেখা হয়ে যাক। আমরা পরে দেখব।

অতএব চন্দ্র ও সুপিনের সঙ্গে আমিও নিঃশব্দে সহযাত্রীদের কবিপ্রীতি দেখতে থাকি। তবে বেশিক্ষণ সে সুযোগ পাই না। কারণ আমার সহযাত্রীদের অতিরিক্ত উৎসাহ দেখতে পেয়েই গাইড থামটিকে আড়াল করে দাঁড়ান। তারপরে চিৎকার করে বলে ওঠেন—কিউ প্লিজ! সিঙ্গল লাইন। কিউ···

সহযাত্রীদের সে নির্দেশ পালন করতে হয়। ফলে বিনা শক্তি-ক্ষয়েই কিছুক্ষণ বাদে সেই খোদাই করা নামটির সামনে এসে দাঁড়াই।

পর পর পাথর সাজিয়ে থাম। একই আকারের চৌকো পাথর। তারই তলার দিকে চারখানি পাথরের ওপরে নাম খোদাই, অনেক নাম। কতগুলো এত গভীরভাবে খোদাই করা যে দেখে মনে হচ্ছে, নামের মালিকরা ছেনি ও হাতুড়ি নিয়ে মন্দির দর্শনে এসেছিলেন।

কেবল সংখ্যা নয়, জাতীয়তার বিচারেও নামগুলো বৈচিত্র্যময়। কোন্‌টি গ্রীক, কোনটি ইতালিয়ান, কোনটি ইংরেজ ফরাসী জর্মন, কোনটি বা এশিয়ান আফ্রিকান অথবা আমেরিকান। ভগ্ন মন্দিরের এই পাথর ক'খানিতে সারা বিশ্ব এসে মিলিত হয়েছে।

কবি বায়রণ তাঁর নাম খোদাই করেছেন নিচের থেকে তৃতীয় পাথরখানির তলার দিকে। শুধু "Byron" শব্দটি খোদিত। আমি দেখি। একবার হাত বোলাই। মনে মনে প্রণাম জানাই। আর ভাবি, অন্যান্যদের সঙ্গে কবি বায়রণের মানসিকতার পার্থক্য ছিল। অন্যান্যদেব মতো অমর হবার বাসনা নিয়ে তিনি এখানে নাম খোদাই করেন নি। তিনি পরাধীন গ্রীসের মুক্তিকামী মানুষের মাঝে মিশে যেতে চেয়েছেন বলেই এখানে তাঁর নামটি খোদাই করে গিয়েছেন।

কবির কামনা পূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণ গ্রীসের জাতীয়কবির মর্যাদা লাভ করেছেন। এবং আজও তিনি গ্রীসের মানুষদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে চলেছেন।

কবির নাম দেখা হলে সবার সঙ্গে উঠে আসি মন্দিরের মাঝখানে। তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠতে হল। মন্দিরের ভেতরে মেঝের অবস্থা খুবই শোচনীয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই হোঁচট খেতে হবে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে মন্দিরের গড়নটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মেঝের ওপরে চারদিকেই প্রায় কোমরসমান পাথরের দেওয়াল। তারই ওপরে সমান দূরত্বে থামের সারি। একখানির ওপরে আরেকখানি পাথর সাজিয়ে থাম, পার্থেনন মন্দিরের মতো। দুটি থামের মাঝখানে পৃথক পৃথক পাথরের চৌকো কড়িকাঠ। তারই ওপরে ফ্রীজ বা সেই মূর্তিমালা। আমরা আবার সেগুলি দেখি।

দেখতে দেখতে শুনি গাইডের কথা। তিনি বলছেন—এ মন্দিরেও পজিডন দেবের পূর্ণাবয়ব মূর্তি ছিল আর এখানেও প্রচুর মূল্যবান ঐশ্বর্য সঞ্চিত থাকত। ..

ঠিক কোন্‌খানে কে জানে? কিন্তু জানতে পারলেও কোন লাভ হবে কি? বিগতযুগের লোভী মানুষগুলো কি আর আমাদের জন্য কিছু রেখে গিয়েছে!

সুতরাং সে ভাবনা ছেড়ে আরেকবার ভাল করে চারিদিক দেখে নেওয়া যাক। তিনদিকেই শান্ত ও সুনীল সাগর। সাগর নয়, উপসাগর। তাই তীর দেখা যাচ্ছে। সাগরের তীরে তীরে সারি সারি পাহাড়। কোনটি সবুজ, কোনটি কালো, কোনটিবা ধূসর।

এপারে সাগরপারে স্নানার্থীর ভিড়। অবশ্য এই ৭৩ মিটার ওপর থেকে মানুষগুলোকে লিলিপুটের মতই মনে হচ্ছে। তবু তাদের আরেকবার দেখে নিই।

তাদের অনতিদূরে বেশ কয়েকখানি জাহাজ নোঙ্গর করে আছে। মালপত্র ওঠা-নামা করছে। কয়েকখানি পালতোলা নৌকো আর কয়েকটি স্পীডবোট যাওয়া-আসা করছে। বোধকরি পর্যটকরা জলবিহার করছেন।

জল থেকে মাটির দিকে দৃষ্টি ফেরাই। অন্তরীপ থেকে মূলভূখণ্ডের দিকে তাকাই। কোথাও বন্ধ্যা, কোথাও বনভূমি। কোথাও

পাহাড় কোথাও বা সবুজ সমতল। তারই বুক চিরে পথ। যে পথ দিয়ে আমি এথেন্স থেকে এখানে এসেছি, আবার যে পথ দিয়ে এথেন্সে ফিরে যাবো।

আমি দেখি আর দেখি। এ দেখার শেষ নেই। কিন্তু দিনের শেষ আছে। দেখতে দেখতে গোধূলি ঘনিয়ে এলো সউনিয়নের মাটিতে, সাগরে আর আকাশে। মাটিতেই আঁধার এলো সবার আগে। মনে হল কালো চাদরে সারা শরীর ঢেকে নিয়ে কর্মক্লান্ত পৃথিবী পড়ল ঘুমিয়ে।

তারপরে আঁধার নেমে এলো সাগরের বুকে। জাহাজ আর নৌকোর বাতিগুলো আঁধারের আলো হয়ে রইল জেগে। এবারে আকাশের পালা।

না। আকাশ আঁধার হল না। তার বুকে জ্বলে উঠল লক্ষ তারার দেয়ালী। তারপরে পুবের সাগর থেকে ভেসে উঠল চাঁদ। সাগরের বুকে সোনালী আলো ছড়িয়ে দিয়ে সে আকাশের কোলে আশ্রয় নিল। চাঁদের আলোয় আকাশ আলো হল, সাগরের আঁধার ঘুচল আর মাটি মোহময়ী রূপ ধারণ করল। সেই আধো আলো আধো ছায়ায় মন্দিরের স্তম্ভগুলি মুহূর্তে রহস্যময় হয়ে উঠল।

রহস্য তো বটেই। ইতিহাসের চেয়ে বড় রহস্য আর কি আছে এই বিশ্বসংসারে! কিন্তু কেবল ঐতিহাসিক স্থানে ঘুরে বেড়ানোই সার হল আমার। ইতিহাসের কোন রহস্যই উদ্ধার করতে পারলাম না।

তাই তো সউনিয়ন আমার কাছে চিরকাল রহস্যময়ী থেকে যাবে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আমি তার আকর্ষণ অনুভব করব। আর ভাবব যে মন্দিরদ্বারে মহামতি সক্রেতিসের পদধূলি পড়েছে, মহাবীর আলেকজান্দারের পদছায়া পড়েছে, মহাকবি বায়রণের পদচিহ্ন রয়েছে, আমিও সেই মন্দির দর্শন করেছি।

তাঁরা ছাড়াও যুগে যুগে কত অসংখ্য মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন এই মন্দিরতলে, সউনিয়নের সীমাহীন সৌন্দর্যসম্ভারে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করে ফিরে গিয়েছেন ঘরে। আগামীদিনে আরও কত মানুষ

আসবেন। তাঁরাও সউনিয়নের সৌন্দর্য দর্শন করে আমারই মতো দিশাহারা হবেন। কিন্তু কেউ এই অখ্যাত ভারত পথিকের নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলির কথা জানতেও পারবেন না। কেবল আমি জেনে গেলাম যুগাতীত কালের সংখ্যাতীত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আমিও একজন।

সেই সাগরপারের পথ পেরিয়ে বাস চলেছে ছুটে। আমরা সউনিয়ন থেকে এথেন্স ফিরে চলেছি। সকল কৌতূহলের ঘটেছে অবসান। সুতরাং সহযাত্রীরা কেউ কোন প্রশ্ন করছেন না। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। আর গাইড একেবারেই নীরব। তিনি তাঁর জায়গায় বসে চোখ বুজে রয়েছেন। ঘুমুচ্ছেন কি? বোধ করি নয়। ক্লান্তি বিনোদনের জন্যই চোখ বুজে আছেন।

আর তাঁকে এই চোখ বুঝে থাকতে দেখেই বোধহয় স্বপিনের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি এসে যায়। সে সবিনয়ে ভদ্রমহিলাকে বলে—মাদাম, যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করি।

—বেশ তো করুন। চোখ মেলে ভদ্রমহিলা বলেন।

স্বপিন প্রস্তাব করে—দেখুন, এরকম চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না। আমরা সউনিয়ন দেখে ফিরে চলেছি। আপনিই বলছেন, সউনিয়নের সঙ্গে ইলিয়দ এবং ওদিসির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। আপনি যদি আমাদের সংক্ষেপে একটু হোমার ও তাঁর মহাকাব্যের কথা বলতেন।

আশ্চর্য! ভদ্রমহিলা কিন্তু আপত্তি করেন না। তিনি দুষ্টু-মেয়ের ফাঁদে ধরা দিয়ে বলতে শুরু করেন—মহাকবি হোমার জন্মে-ছিলেন খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকে। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রীসের সাতটি রাজ্য দাবী করে তিনি তাদেরই লোক। বলা বাহুল্য আমাদের অর্থাৎ এথেন্সবাসীদের দাবীটাই সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ। কারণ মহাকবির প্রধান কর্মস্থল ছিল এথেন্স। তবে হোমার একজন ক্লান্তিহীন পর্যটক ছিলেন। তিনি প্রতিবেশী দ্বীপসমূহ সহ সমগ্র

গ্রীসদেশ ভ্রমণ করেছেন।

হোমারের বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত চারণকবি। তাই স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করে তিনিও তার বীণাটি হাতে নিয়ে বহুবর্ণে চিত্রিত এক আলখাল্লা পরে পথে বেরিয়ে পড়েন। স্বরচিত গান গাইতে গাইতে সারা দেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। ইলিয়দ এবং ওদিসি রচনাও এই গান গেয়েই।

খ্রীস্টজন্মের সাড়ে আটশ' বছর আগে রচিত ইলিয়দ এবং ওদিসি দুটি পৃথক মহাকাব্য হলেও একই কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত। কাহিনীটি আপনারা সবাই জানেন ট্রয়ের যুদ্ধ।

আমরা মাথা নাড়ি। গাইড বলতে থাকেন—ট্রয়যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যতা না পাওয়া গেলেও মহাকবির জন্মের আগে একবার এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাজারা প্রায় সবাই সেইযুদ্ধে কোন না কোন পক্ষ নিয়েছিলেন। হোমারের সময়ে সেই যুদ্ধের কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরত। তাই হোমার ভেবেছিলেন যুদ্ধকে অবলম্বন করে কোন গীতিকাব্য রচনা করলে তা সমাদৃত হবে। তাঁর সে ভাবনা সত্য হয়েছে। ভ্রাম্যমান চারণকবি তৎকালীন গ্রীসের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর সেই মহাকাব্য আজ প্রায় তিন হাজার বছর পরেও সারা বিশ্বে সমান আদৃত।

অনেকের মতে হোমার জন্মান্ধ ছিলেন আবার কেউবা বলেন তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয় দ্বিতীয় মতটি সত্য হতে পারে। কারণ জন্মান্ধ হলে তাঁর মহাকাব্যে আমরা বিভিন্ন মন্দির ও প্রাসাদের এমন বাস্তব বর্ণনা কিম্বা এমন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ পেতাম না।

একদল আধুনিক গবেষক অবশ্য মনে করেন, হোমার একজন নন। জনৈক পুরুষকবি ও জনৈকা মহিলাকবি মিলেই হোমার। পুরুষকবি ইলিয়দ ও মহিলাকবি ওদিসি রচনা করেছেন। আবার অনেকে বলেন দুটি মহাকাব্যই পুরুষ হোমারের রচনা। তবে ওদিসি

মহাকাব্যে তাঁর মেয়ে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন।

কিন্তু যাক্ গে এসব কথা। মহাকবির তিরোভাবের প্রায় ছ'শ বছর পরেও কিন্তু কবিতাগুলো ছিল ছটিয়ে ছড়িয়ে, ছিল মানুষের মুখে মুখে গ্রীসের ঘরে ঘরে। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে গ্রীক পণ্ডিত সামোথেসের অ্যারিস্তার্কাস প্রচুর পরীক্ষার পরে ইলিয়দ এবং ওদিসির মূল-রচনাগুলি একসঙ্গে সঙ্কলিত করে দুখানি মহাকাব্যের রূপ দান করেন। সেই থেকে বিশ্বের দেশে দেশে দুই মহাকাব্যের জয়যাত্রা শুরু এবং তা আজও অব্যাহত।

আরিস্তোতল বলেছেন, ইলিয়দ শুধু মহাকাব্য নয়, বিশ্বের প্রথম সার্থক ট্র্যাজিডি। কোন কোন সমালোচক বলেছেন, নবজাগরণ মানেই হোমার। 'Flashback' বা অতীতচারণা দিয়ে কাহিনী শুরু করার যে রীতি আজ সারা বিশ্বে অনুসৃত, মহাকবি হোমারই তার আবিষ্কর্তা। 'Suggestiveness' বা ব্যাঞ্জনধর্মিতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হোমারের রচনানৈপুণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হোমারের যেমন ছিল জীবনবোধ, তেমনি অসাধারণ ছিল তাঁর সৌন্দর্যবোধ। চেতন-অচেতন ছোট-বড় প্রতিটি বস্তু ও প্রাণের মাঝে তিনি এক সহজ ও সুন্দর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। হোমারের মহাকাব্য ক্ল্যাসিকাল। কিন্তু তিনি কখনও সংযমের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। আর তাই মহাকবি হোমার আজও অমর এবং চিরকাল অমর থাকবেন।

থামলেন গাইড। বাস ছুটে চলেছে সউনিয়ন থেকে উর্বশী এথেন্সের পথে। বাইরে চাঁদের আলো আর ভেতরে নাইট ল্যাম্প। উভয়েই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কারণ বাসের ভেতরে অখণ্ড নীরবতা। আমরা যে এতক্ষণ মহাকবি হোমারের কথা শুনছিলাম।

গাইডের কণ্ঠস্বরে নীরবতার অবসান হয়। তিনি বলেন—এবারে আমি আপনাদের কাছে সংক্ষেপে ইলিয়দ এবং ওদিসির কথা বলছি।

আবার সোজা হয়ে বসি। গাইড শুরু করেন—এই দুটি মহা-কাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি। অ্যারিস্তার্কাস

ইলিয়দ মহাকাব্যকে চব্বিশটি খণ্ডে সংকলিত করেছেন। ট্রয় নগরের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়ন-এর (Ellion) নামানুসারে কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে।

ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পুত্র প্যারিস বেড়াতে এসেছিলেন মেনেলাসের রাজ্যে। সম্মানিত অতিথিকে মেনেলাস পরম সমাদরে প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে অকৃতজ্ঞ প্যারিস মেনেলাসের যুবতী স্ত্রী হেলেনের ঘনিষ্ঠ হলেন। এবং একদিন সেই পরমাসুন্দরী গ্রীসকন্যাকে নিয়ে দেশে পালালেন। হেলেনকে ফিরিয়ে আনার জন্য গ্রীক বীরগণ ট্রয় অবরোধ করেন। এই যুদ্ধের কাহিনী দিয়েই ইলিয়দ মহাকাব্য। শুধু মানুষ নয়, অলিম্পাসের দেবতারাও এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আর ট্রয়বাসীদের জীবনযাত্রার ভারী সুন্দর বিবরণ রয়েছে এই মহাকাব্যে। অর্থাৎ দেব-দেবী রাজপুত্র-রাজকন্যা ও জনসাধারণ কেউই উপেক্ষিত নয় এই মহাকাব্যে।

মূল কাহিনীকে অবলম্বন করে জড়িয়ে আছে ছোট-বড় আরও নানা কাহিনী। প্রত্যেকটি কাহিনী পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। যেমন প্রাথমিক যুদ্ধজয়ের পুরস্কার রূপে গ্রীকবীর আগামেনন সুন্দরী খ্রীসিসকে (Chryseis) লাভ করেন। কিন্তু খ্রীসিস ছিলেন অ্যাপোলোদেব মন্দিরের পুরোহিতকন্যা। পুরোহিত দেবতার কাছে কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করলেন। দেবরোষে গ্রীকশিবিরে মহামারী দেখা দিল। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ককাস (Calchas) ঘোষণা করলেন, দেবরোষ থেকে মুক্তি পেতে হলে অবিলম্বে খ্রীসিসকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অগত্যা আগামেননকে তাই করতে হল। কিন্তু তিনি তারপরেই আকিলিস-এর যুদ্ধবিজয়ের পুরস্কার সুন্দরী ক্রীতদাসী ব্রাইসিসকে (Briseis) নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। অপমানিত আকিলিস অস্ত্রত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু সেনাপতি পেত্রোক্লাসকে মিরমিদন (Myrmidon) সেনাবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসার নির্দেশ পাঠালেন। এবং পেত্রোক্লাস (Patroclus) সে নির্দেশ পালন করলেন।

সুদক্ষ সেনাপতির অভাবে গ্রীক সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। বিপদ বুঝে আগামেনন নিজের অপরাধ কবুল করে আকিলিসের কাছে দূত পাঠালেন। তাঁর সাহায্য ভিক্ষে করলেন। কিন্তু আকিলিস তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। সুযোগ বুঝে ট্রোজান সৈন্যরা গ্রীস জাহাজগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিতে থাকলেন।

বন্ধু পেট্রোক্লাস আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। পরাজয়ের গ্লানি থেকে গ্রীকজাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি আকিলিসকে অভিমান ত্যাগ করার অনুরোধ করলেন। আকিলিস সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তবে তিনি নিজে অস্ত্র ধারণ করলেন না। তাঁর সেনাবাহিনীকে পেট্রোক্লাসের হাতে সমর্পণ করলেন।

পেট্রোক্লাস অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে ট্রোজান আক্রমণ প্রতিহত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রোজান সেনাপতি রাজপুত্র হেক্তরের হাতে নিজে নিহত হলেন। বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আকিলিস অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি আগামেননের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিলেন। মত্ত হাতির বেগে ট্রোজান সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে হেক্তরকে হত্যা করলেন। তারপরে বন্ধু বিরহে অস্থির আকিলিস হেক্তরের মৃতদেহ রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন।

প্রিয়তম পুত্রের শোকে কাতর হয়ে বৃদ্ধ ট্রয়রাজ প্রায়াম আকিলিসের কাছে এলেন। তিনি তাঁর কাছে পুত্র হেক্তরের মরদেহ প্রার্থনা করলেন।

আকিলিসের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি বৃদ্ধ রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। হেক্তরের মৃতদেহ ঘিরে ট্রোজান শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এলো। স্বয়ং হেলেন পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, হেক্তর! তুমি আমার কাছে স্বামীর সব ভাইদের মধ্যে প্রিয়তম ছিলে। বিশ বছর আগে আমি ঘর ছেড়ে এখানে এসেছি। কিন্তু তুমি এর মধ্যে কখনও আমাকে কোন অপমান ক'রো নি। এমন কি তোমার ভাই-বোনদের কেউ আমাকে কোন খারাপ কথা বললে

তুমি তাদের তিরস্কার করেছো। ট্রয়নগরীর সবাই আজ আমাকে ঘৃণা করে। কারণ আমার জন্যই ট্রয় ধ্বংস হল। তুমিও আমার জন্যই অকালে ট্রয় ছেড়ে চলে গেলে। তোমার অকাল মৃত্যুতে আজ আমার দুঃখের বোঝা আরও বেড়ে গেল।

হেক্তরের অন্ত্যেষ্টিকে ঘিরে এক শোকসন্তপ্ত পরিবেশের মাঝে দুই বিবদমান জাতি সন্ধি স্থাপন করলেন। আর সেই সঙ্গে শেষ হল ইলিয়দ মহাকাব্য।

চুপ করলেন গাইড। আবার সেই অখণ্ড নীরবতা। সেই রহস্যময় পরিবেশ। মনে হচ্ছে এখনও যেন আমরা মহাকাব্যের জগতেই রয়ে গিয়েছি।

কিন্তু কম্‌লি ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে নীরবতা ভঙ্গ করে সুপিন বলে—আন্টি! এবার তাহলে এমনি সংক্ষেপে একটু ওদিসি-র কথা বলুন।

না। এ মেয়েটা সত্যি ম্যানেজ করতে জানে। গাইডকে 'আন্টি' ডাকতে শুরু করেছে।

আর তাতে কাজও হয়। গাইড বিগলিত কণ্ঠে বলেন—বলব বৈ কি মা, নিশ্চয়ই বলব। তারপরে ঘড়ি দেখে নিয়ে আশ্বাস দেন—তুমি ভয় পেয়ো না। আমাদের হাতে এখনও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। এথেন্স পৌঁছবার আগে ওদিসি-র কথা শেষ হয়ে যাবে।

আবার সেই অখণ্ড নীরবতা আর বাসের একটানা শব্দ। জানলা-দরজা বন্ধ বলে সামান্য শব্দই কানে আসছে। কিন্তু সেই শব্দকেই জীবনের স্পন্দন বলে মনে হচ্ছে।

নীরবতার অবসান ঘটে। গাইড বলতে শুরু করেন—ওদিসি মহাকাব্য ইলিয়দ মহাকাব্যের পরিপূরক। এই মহাকাব্যেও চব্বিশটি অধ্যায়। মূল কাহিনী হল ট্রয়যুদ্ধ শেষ হবার পরে গ্রীকবীর ওদিসিউস তাঁর রাজ্য ইথাকায় ফিরে আসার পথে নানা বাধার সম্মুখীন হন। ফলে তাঁর বাড়ি ফিরতে বহু বছর দেরি হয়ে যায়।

বাড়ি ফেরার পরে আবার তাঁর স্ত্রী পেনিলোপি তাঁকে চিনতে পারেন না। শুধু তাই নয় তিনি মারা গেছেন ধরে নিয়ে তখন তাঁর স্ত্রীর আবার একদল পাণিপ্রার্থী জুটে গিয়েছে। তাদের হত্যা করে এবং আত্মপরিচয় প্রমাণ করে শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় তাঁর সুখের সংসার ফিরে পেলেন।

এই মূল কাহিনীর মাঝে আবার একটি উপ-কাহিনী আছে। ওদিসিউসের ছেলে তেলিমেকাস তাঁর বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর সেই অভিযানের কথা।

থামলেন গাইড। সঙ্গে সঙ্গে যেন আঁতকে ওঠে সুপিন। জিজ্ঞেস করে—সেকি! শেষ হয়ে গেল?

—না। হেসে দেন গাইড। বলেন—শেষ হবে কি, এখনো যে শুরুই হয় নি!

—তাই বলুন। সুপিন নিশ্চিন্ত।

গাইড শুরু করেন—ট্রয় পতনের দশ বছর পরে ওদিসির কাহিনী আরম্ভ। ইতিমধ্যে ওদিসিউস ছাড়া জীবিত অন্যান্য গ্রীকবীরগণ ঘরে ফিরে গিয়েছেন। ওদিসিউস ফিরতে পারেন নি কারণ কালিপ্সো নামে জনৈকা জলদেবী তাঁকে এক জনহীন দ্বীপের গুহায় বন্দী করে রেখেছেন। অবশেষে দেবরাজ জিউসের আদেশে জলদেবী ওদিসিউসকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। নিজেই একটি নৌকো তৈরি করে ওদিসিউস তাঁর রাজ্য ইথাকার পথে রওনা হলেন।

এদিকে পেনিলোপি যখন ইথাকার রাজপ্রাসাদে স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছেন, তখন একদল রাজপুরুষ তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে ওদিসিউস মারা গেছেন, তিনি আর ফিরে আসছেন না। অতএব পেনিলোপির উচিত তাঁদের কাউকে পতিত্বে বরণ করা। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পেনিলোপির জীবন দুর্বিসহ করে তুললেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। তিনি সেই পাণিপ্রার্থীদের বললেন, আমি আমার শ্বশুরমশায়ের সমাধি আচ্ছাদনের জন্য এই চাদরখানি বুনছি। এখানি বোনা শেষ হবার পরে আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হব।

কিন্তু চাদর বোনা আর শেষ হয় না। হবে কেমন করে? দিনে পাণিপ্রার্থীদের দেখিয়ে যতটা বুনতেন, রাতে আবার সেটুকু খুলে ফেলতেন।...

—ভারী মজা তো! মাঝখানে সুপিন বলে ওঠে।

—হ্যাঁ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাণিপ্রার্থীরা কৌশলটা ধরে ফেললেন। বাধ্য হয়ে পেনিলোপির পুত্র তেলিমেকাস-কে তাঁর বাবার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে বললেন। বন্ধু পীজেসস্ত্রেতাসকে নিয়ে নানা রাজ্য পর্যটনের পর তেলিমেকাস পৌঁছলেন মেনেলাসের প্রাসাদে। মেনেলাস ও হেলেন তাঁদের খুবই আদর-যত্ন করলেন। কিন্তু তাঁরা ওদিসিউসের কোন সংবাদ দিতে পারলেন না। এর পরেই দেবী এথেনা তাঁদের ইথাকায় ফিরে যেতে বললেন। তাঁরা দেশে ফিরে এলেন।

নিজের হাতে তৈরি করা নৌকোয় চেপে ওদিসিউস সাগর পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেরে উঠলেন না। কারণ যৌবনে ওদিসিউস একদিন রেগে গিয়ে সাগর দেবতা পজিডনের ছেলে পলিফেমাসের চোখ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। সুযোগ পেয়ে পজিডন তার বদলা নিলেন। সমুদ্রে ঝড় তুলে ওদিসিউসের নৌকোটা ডুবিয়ে দিলেন। ভাসতে ভাসতে তিনি এসে পৌঁছলেন ফিয়েসীয়দের দেশে। সে দেশের রাজকন্যা তাঁকে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দান করলেন। তারপরে তাকে নিয়ে গেলেন রাজা আলসিনাস-এর কাছে। কথায় কথায় ওদিসিউস রাজাকে আপন বীরত্বের বিভিন্ন কাহিনী শোনালেন।

সব শুনে রাজা আলসিনাস মুগ্ধ হলেন। নানা উপঢৌকনসহ একখানি ছোট জাহাজ তাঁকে দান করলেন। জাহাজে চড়ে ওদিসিউস রওনা হলেন দেশে। এবং সে জাহাজ শেষ পর্যন্ত ইথাকায় পৌঁছল। কিন্তু ওদিসিউস উপঢৌকন নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছতে পারলেন না। কারণ পজিডনের শাপে জাহাজটা বন্দরে নোঙর করেই পাথর হয়ে গেল।

কিন্তু তারপরেই দেবী এথেনা রাখাল রূপে তাঁকে দর্শন দিলেন।

তিনি ওদিসিউসকে বিগত বিশ বছরের সবকথা জানালেন। পেনিলোপির অসহায় অবস্থার কথা বললেন। এবং অবশেষে মন্ত্রবলে তাঁকে একজন ভিখারী বানিয়ে দিলেন। ভিখারীর বেশে ওদিসিউস ইউমিয়াস নামে একজন শূকরপালকের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে পুত্র তেলিমেকাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ছেলের কাছে আপন পরিচয় দিলেন। বহু বছর বাদে ছেলের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ভিখারীর বেশেই ওদিসিউস আপন প্রাসাদে এলেন। পেনিলোপির পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বেঁধে গেল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ওদিসিউস অন্দর মহলে এলেন। কিন্তু পেনিলোপি চিনতে পারলেন না তাঁকে। তখন ওদিসিউস তাঁর রেখে যাওয়া ধনুকে গুণ পরিয়ে আত্মপরিচয় প্রমাণ করলেন। তারপরে শয়নকক্ষে গিয়ে পালঙ্কে তাঁর নিজের হাতেব খোদাই করা কাজটুকু দেখিয়ে দিলেন। পেনিলোপি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন, চিনতে পারলেন স্বামীকে। তিনি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। সতীসাধ্বী স্ত্রীকে বুকে টেনে নিলেন ওদিসিউস। মিলনানন্দে মুখরিত হয়ে উঠল ইথিকার আকাশ বাতাস আর মাটি।

এবং সেই সঙ্গে শেষ হল মহাকবি হোমারের ওদিসি ,মহাকাব্য। আর ফুরলো আমার কথা। কারণ বাইরে তাকিয়ে দেখুন, আমরা এথেন্স ফিরে এসেছি।

এগারো

'তিনটি পর্বত মানুষের অগ্রগতির সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মানঃ হিমালয় —ভারতীয় আর্য-সভ্যতার, সিনাই—হিব্রু-সভ্যতার, অলিম্পাস— গ্রীক-সভ্যতার। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না ; সুতরাং তাহারা

চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখ হইয়া ধর্মের উন্নতি সাধন করিল। তাহারাই আবিষ্কার করিল যে, মানব-মনের শক্তি সীমাহীন; অতএব তাহারা মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইহার মাধ্যমে তাহারা শিখিল যে, মানুষের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা লুকায়িত আছে এবং ঐ সত্তা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই সত্তার বিকাশ-সাধনই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইল।

আর্যজাতির অপর একটি শাখা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সৌন্দর্য-মণ্ডিত গ্রীস দেশে প্রবেশ করিল। গ্রীসের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকুল হওয়ায় তাহাদের কার্যকলাপ বর্হিমুখ হইয়া পড়িল এবং এইরূপে তাহারা বাহ্যশিল্প ও বাহিরের স্বাধীনতার বিকাশ সাধন করিল। গ্রীকজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুসন্ধান করিয়াছিল। হিন্দুগণ সর্বদাই আধ্যাত্মিক মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। উভয় পক্ষই একদেশদর্শী। জাতীয় সংরক্ষণ অথবা স্বাদেশিকতার প্রতি ভারতীয়গণের তত মনযোগ নাই। তাহারা কেবল ধর্মরক্ষায় তৎপর। অপর পক্ষে গ্রীকজাতির নিকট এবং ইওরোপে (যেখানে গ্রীক সভ্যতার ধারা অনুসৃত হইয়াছে) স্বদেশের স্থান অগ্রে। সামাজিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রযত্ন ক্র[illegible] বিশেষ, কিন্তু উহার বিপরীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল সামাজিক মুক্তির জন্য যত্নবান হওয়া আরও দোষাবহ। আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক উভয়বিধ মুক্তির জন্যই চেষ্টা প্রয়োজন।'*

চিকাগো ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার পরে একটি আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট আজ এথেন্সের একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রচনাটির শিরোনাম 'The Hindu And Greek Nation By Swami Vivekanand.'

শুয়ে শুয়ে সেই লেখাটি দেখছিলাম আর স্বামীজির কথা ভাবছিলাম। ইতিহাস ও দর্শনের কতখানি গভীরে প্রবেশ করতে পারলে এমন বক্তব্য রাখা যায়। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে তাঁর

* স্বামীজীর বাণী ও রচনা (দশম খণ্ড)

ধারণা কত স্বচ্ছ ও আন্তরিক ছিল। সবচেয়ে বড় কথা শতবর্ষ আগে তিনি যেসব কথা বলে গিয়েছেন, তা আজও দিবালোকের মতো সত্য হয়ে রয়েছে।···

কিন্তু বিবেকানন্দের কথা ভাবার আর অবকাশ নেই। ওরা এসে গিয়েছে। ডোর-বেল বেজে উঠল।

বিছানা থেকে নেমে পড়ি। দরজা খুলে দিই।

ঠিকই অনুমান করেছি। ওরাই এসেছে, চন্দ্র আর সুপিন।

—সেকি! আঙ্কল তুমি এখনও রেডি হও নি! সুপিন ধমক লাগায়।

—না। একটু শুয়ে ছিলাম। এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

—শুয়ে ছিলে! দেখি দেখি। শরীর খারাপ করেছে নাকি? সে আমার কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে।

হেসে বলি—লেডী ডাক্তারের কি সিদ্ধান্ত?

—না। জ্বর হয় নি। তাহলে বোধহয় মাথা ধরেছে?

আমি মাথা নাড়ি।

—পেট ব্যথা?

—না।

—গা হাত-পা কামড়াচ্ছে?

—না, তাও নয়।

—তাহলে বলো এমনিই শুয়ে ছিলে, তোমার শরীর ভাল আছে?

—সেকথা বলার সুযোগ দিলে কোথায়?

—বেশ, এবারে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও!

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা নিচে নেমে আসি। রিসেপশানিস্ট সুপ্রভাত জানান। জিজ্ঞেস করেন—আজ কোথায় যাবেন?

—আজ আমরা আর কোন বাসট্রিপ নেবো না। নিজেরাই এথেন্স দেখব। সাবওয়ে চড়ব। সুপিন জবাব দেয়।

—কিন্তু কাল আমরা একটা One day Cruise Tour নিতে চাইছি। চন্দ্র যোগ করে।

-কোনটা নেবেন? রিসেপশানিস্ট সেই লাল পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে দেখতে শুরু করেন। একটু বাদে জিজ্ঞেস করেন—Hydra—Poros—Aegina. এটা সারাদিনের ভ্রমণ; সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে সাতটা। ওঁরাই লাঞ্চ্ দেবেন। জনপ্রতি ভাড়া ২১০০ ড্রাসমাস।

—তার মানে?

—৩৫ মার্কিন ডলার।

টাকার অঙ্কটা আমার পক্ষে বেশ বেশি। তাহলেও যখন গ্রীস দেশে আসতে পেরেছি, তখন একটা দিন ভূমধ্যসাগরে ভাসতেই হবে। অতএব ভদ্রলোকের কাছে নাম ও রুম নম্বর লিখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসি হোটেল থেকে।

বড় রাস্তায় আসি। চলতে চলতে চন্দ্র বলে—আমরা সাবওয়ে স্টেশনে যাচ্ছি। কিন্তু ইচ্ছে করলে বাসে করেও যেতে পারতাম। এথেন্স শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রয়োজনীয় পরিবহন হচ্ছে বাস। শহর থেকে শহরতলী পর্যন্ত সর্বদা বাস যাতায়াত করছে, একেবারে টাইম-টেব্‌ল মেনে। আপনি ইচ্ছে হলে ফোন করে বাসের সময় ও ভাড়া জেনে নিতে পারেন।

—ফোন নাম্বার প্লীজ? গম্ভীর স্বরে সুপিন প্রশ্ন করে।

পকেট থেকে নোট-বুক বের করে গম্ভীরতর স্বরে চন্দ্র উত্তর দেয়—512-4910

ওদের অভিনয় দেখে হেসে ফেলি। কিন্তু ওরা আমার সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় না। বরং নায়িকা আবার গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন ছাড়ে—এখানে রেল-ব্যবস্থা কি রকম?

—খুবই ভাল।

—যেমন?

—তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ?

—তাতে লাভ কি? তুমি তো চিরকালের ফেল-মাস্টার। তাই আমি শুধু এথেন্স শহরের রেল ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা

ধারণা করতে চাইছি।

এবারে একটু হেসে দেয় চন্দ্র। কিন্তু সে পাশ-ফেলের প্রসঙ্গ না তুলে সোজাসুজি সুপিনের প্রশ্নের উত্তর দেয়—এথেন্স শহরে দুটি টার্মিনাল রেল স্টেশন লারিসা (Larisa) এবং পেলোপনিজ। প্রথমটি উত্তর-গ্রীস ও বিদেশ যেমন পারি জুরিখ রোম ভিয়েনা প্রভৃতি জায়গায় যাবার জন্য। আর দ্বিতীয়টি দেশের অন্যান্য স্থানে যেমন করিন্থ পাতরাস এবং অলিম্পিয়া প্রভৃতি জায়গায়। দুটি স্টেশনই ওমোনিয়া স্কোয়ারের মাইল খানেক দূরে।

—তার মানে তো আমাদের হোটেলের বেশ কাছে ?

চন্দ্র মাথা নাড়ে।

কথা বলতে বলতে আমরা ওমোনিয়ায় (Omonia) অর্থাৎ এথেন্সের গড়িয়াহাটায় পৌঁছে যাই। অমন জনারণ্য ও জ্যাম-জটিল নয় অবশ্য। তাহলেও অনেকগুলো পথের বেশ ব্যস্তবহুল সঙ্গম। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি আর আলো ঝলমল দোকান।

আমরা সাবওয়ে বা মেট্রোরেল স্টেশনে নেমে আসি। গ্রীকরা মেট্রোরেলকে বলেন ইলেক্ট্রিকোস (Ilektrikos)। আচ্ছা, আমরাই বা মেট্রোরেল বলি কেন ? ফরাসিরা তো শুধুই মেট্রো বলেন। নামটা যখন ফরাসী থেকেই নেওয়া হল, তখন আবার তার সঙ্গে 'রেল' যোগ করা কেন ?

যাক্ গে কলকাতার কথা। তবে এখানেও কিন্তু কলকাতার মতই একটিমাত্র লাইন। উত্তরের শহরতলী কিফিসিয়া (Kifisia) থেকে দক্ষিণের বন্দরনগরী পাইরিউস পর্যন্ত যাতায়াত করে। যে কোন স্টেশন থেকে যেকোন স্টেশনে যাবার একই ভাড়া ২০ দ্রাশমাস অর্থাৎ ০·৩৫ ডলার।

সুপিন ষাট দ্রাশমাস অর্থাৎ এক ডলার দিয়ে তিনখানি টিকেট করে আনে। আমরা ইচ্ছে করলে রিটার্ণ টিকেট করতে পারতাম। কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে ফিরতে হবে, কিছুই জানি না। আমরা আজ নিজেরাই এথেন্স দেখতে বের হয়েছি।

সাবওয়ে স্টেশনটি বেশ ছিমছাম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেকটা আমাদের এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের মতো। এখানেও এসক্যালেটার রয়েছে। তেমনি প্লাটফর্মের দু-পাশে দুটি লাইন।

একটু বাদে গাড়ি আসে। দরজা খুলে যায়। গাড়িতে উঠি। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি চলতে শুরু করে। কিন্তু কেউ সেকথা ঘোষণা করেন না, কিম্বা বলেন না পারবর্তী স্টেশনের নাম। বাস্তবিক পক্ষে লণ্ডন, পারি, বার্লিন, বন, স্টকহোম, রোম ইত্যাদি কোথাও আমি কলকাতার মতো ঘোষণা শুনতে পাই নি। কেবল লণ্ডনের উপকণ্ঠে যাতায়াত করবার সময় বৃটিশ রেলওয়েজে ঘোষকের কণ্ঠস্বর শুনেছি। কিন্তু তাও কলকাতার মতো অতো সুন্দর করে বলা নয়।

গাড়ি চলছে। আমরা এখন মাটির ওপরে উঠে এসেছি। দু-দিকে উঁচু দেওয়াল, মাঝখানে পাশাপাশি দুটি লাইন। তারই ডানদিকেরটির ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে। এ ব্যাপারটাও য়ুরোপের প্রায় সব শহরেই দেখছি। সুযোগ পেলেই ওরা মেট্রো লাইন মাটির ওপরে তুলে নিয়ে এসেছেন। কারণ ওপরে লাইন পাততে খরচ অনেক কম। সুতরাং মেট্রো মানেই পাতালরেল নয়।

ভাবতে ভাবতে আমাদের স্টেশন এসে যায়। বাইরে বেরিয়ে আসি। আর এসেই দেখি গাছে ছাওয়া পাহাড়ে ঘেরা মনোরম শহরতলী। দূরে একটা বেশ উঁচু পাহাড় আর কাছে চারিদিকেই প্রচুর পাইনগাছ। তারই ছায়ায়-ছায়ায় সুশীতল মসৃণ পথ। সামনে গাছের ফাঁকে স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে। আর তার ওপাশে গম্বুজাকৃতি উঁচু পাহাড়টি দেখিয়ে চন্দ্র বলে—আর্দেতাস হিল।

বেশ কয়েক মিনিট হেঁটে ক্রীড়াঙ্গনের তোরণে পৌঁছই। চারিদিকেই পাইন বন। এবং তাই এটি এমন মনোরম। চড়াইপথ পেরিয়ে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসি স্টেডিয়ামে। ডিম্বাকৃতি ক্রীড়াঙ্গন। আকারে খুব বড় নয়। অথচ আসন সংখ্যা কম নয়। তিনদিকে ধাপে ধাপে আসন, অনেকটা উঁচু পর্যন্ত। চন্দ্র জানায়—সত্তর হাজার দর্শক বসতে পারেন।

একটা ধাপে ধপ করে বসে পড়ে স্থপিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আমরাও বসে পড়ি পাশে। অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে।

একটু বাদে কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে স্থপিন স্বামীকে বলে—এবারে মিস্টার গাইড, এই স্টেডিয়াম সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখুন।

স্ত্রীর ঠাট্টাটুকু নীরবে হজম করে চন্দ্র বলে—এটি গত শতকে নির্মিত একালের প্রথম ওলিম্পিক স্টেডিয়াম। সুতরাং তেমন একটা উন্নত কিছু নয়।

—তাহলে এত ছোটাছুটি করালে কেন?

—কারণ এর একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে।

—কী?

—ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ওলিম্পিক উৎসবের জন্য এখানেই একটি ক্রীড়াঙ্গন নির্মিত হয়েছিল। সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল দর্শকাসন। গত শতাব্দীতে যখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রূপে ওলিম্পিক উৎসব পুনরায় আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন গ্রীসের রাজা সেই প্রাচীন ক্রীড়াঙ্গনেই এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করে দেন।

আমি লণ্ডন বার্লিন ম্যুনিখ ও রোমের ওলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখেছি, দেখেছি আমাদের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। আকারে ও আধুনিকতায় তাদের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। কিন্তু ঐতিহ্যের দিক থেকে এটি সত্যিই তুলনাহীন। কারণ এখানেই বসেছিল আধুনিক যুগের প্রথম ওলিম্পিক আসর।

দেখা শেষ হল। আর তখুনি চন্দ্র প্রস্তাব করে—আজ আর পাউরিউস বন্দরে গিয়ে কি হবে? কাল সকালে দ্বীপ-ভ্রমণের জন্য তো যেতেই হবে ওখানে।

—তাহলে আজ আমরা কি করব? সবে যে দশটা বেজেছে।

—তাইতো বলছি, চলো তাড়াতাড়ি ওমোনিয়ায় ফিরে যাই। তারপরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে ফেলি।

—দি আইডিয়া! মাই ভেরী ভেরী গুড হাজব্যাণ্ড।

গাড়ি আসে। আমরা উঠে বসি। আর গাড়ি চলতে শুরু করতেই স্বপিন বলে ওঠে—আঙ্ক্‌ল সংক্ষেপে একটু ওলিম্পিকের ইতিহাসটুকু শোনাও না।

একবার যখন শুনতে চেয়েছে, তখন আপত্তি করে লাভ নেই। সুতরাং শুরু করি—কোন্‌ সুদূর অতীতে প্রথম ওলিম্পিকের আসর বসেছিল, তার ইতিহাস জানা নেই আমাদের।···

—কেন? সেদিন যে বললে হারকিউলিস ওলিম্পিকের প্রচলন করেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু হারকিউলিস তো কেবল ইতিহাসের মানুষ নন, সেই সঙ্গে পুরাণের মহামানব।

—বুঝতে পেরেছি। স্বপিন মাথা নাড়ে।

আমি আবার শুরু করি—অবশ্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন খ্রীস্ট-পূর্ব ৭৭ সালে শুরু হয়েছিল এই উৎসব। তারপর থেকে প্রতি চার বছর বাদে বাদে এই আসর বসেছে প্রায় পৌনে পাঁচশ’ বছর ধরে।

প্রথম দিকে মাত্র একদিন করে প্রতিযোগিতা হত। কেবল ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের ভেতরে একটি দৌড় প্রতিযোগিতা। তারপরে একে একে ‘ডিসকাস থ্রো, ‘জ্যাভেলিন থ্রো’ ‘ব্রড জাম্প্‌’ ‘বক্সিং’ কুস্তি ও কয়েকটি দৌড় অন্তর্ভুক্ত হবার পরে ওলিম্পিক সাতদিনের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। তখন অবশ্য ধর্মীয় পর্বাদি পালনের জন্যও উৎসবে কিছু সময় নির্দিষ্ট থাকত। অবশেষে ৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে রোমসম্রাট থিওডোসিয়াস (Theodosius) এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। বলা বাহুল্য গ্রীস তখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তারপরে ওলিম্পিক আরম্ভ হয়েছে দেড় হাজার বছর বাদে, ১৮৯৬ সালে। শুরু করেছেন একজন দূরদর্শী ফরাসী শিক্ষাবিদ বারোঁ পিয়েরা দ্য কুবেরত্যাঁ (Baron Pierra de Coubertin)। তিনি ১৮৯৪ সালে পারি শহরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। বারোটি বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রেমী দেশের প্রতিনিধিগণ সেই সম্মেলনে মিলিত হন। পুনরায় ওলিম্পিক উৎসব আরম্ভ করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গ্রীস দেশের হারিয়ে যাওয়া উৎসব আবার নবকলেবরে এথেন্স থেকেই আরম্ভ হয়। গ্রীসের রাজা এই ক্রীড়াঙ্গণ তৈরি করে দেন। সেই শুরু। তারপর থেকে বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলো বাদ দিয়ে প্রতি চারবছর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে।

ফিরে এলাম এথেন্স। সাবওয়ে থেকে উঠে এসেই চন্দ্র বলে— 'আসুন, একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। তাহলে লাঞ্চের আগেই আমরা সব দেখে নিতে পারব।

—না। সুপিন বাধা দেয়।

ওর দিকে তাকাই। বোধকরি ট্যাক্সি ভাড়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি আছে। একটু অবাক হই। খরচপত্র নিয়ে এর আগে কখনও তো ওকে কোন কথা বলতে শুনি নি।

সুপিন চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আবার বলে—ট্যাক্সি নিতে পারো একটি শর্তে।

—কি ?

—পুরো ভাড়াটাই তুমি দেবে. আঙ্কেলের কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে না।

হেসে দেয় চন্দ্র। বলে—আমি আঙ্কেলের কাছ থেকে ভাড়া নেবো, এ তুমি ভাবলে কেমন করে ?

—তোমাকে বিশ্বেস নেই। তুমি যা কিপটে !

তবু আমি হাসতে পারি না। গম্ভীর স্বরেই বলি—কিন্তু সব ভাড়াটাই তোমরা দেবে, এ কেমন কথা ?

—ঠিক কথা। সুপিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। বলে—কারণ আমরা দুজন, তুমি একা। আমাদের ট্যাক্সি নিতেই হত। তোমার জন্য যখন কোন বাড়তি খরচ হচ্ছে না, তখন তুমি কেন ভাড়া দেবে ?

—কিন্তু···

—কোন কিন্তু নয়। আঙ্কল প্লীজ, আপত্তি করো না। আচ্ছা, তোমার মেয়ে-জামাই যদি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত, তাহলে কি তুমি ভাড়া দিতে পারতে ?

প্রতিবাদ অচল। আমার কাছে কথাটা কষ্টকর। আমার মেয়ে নেই। তাছাড়া কেমন করে আমি ওকে এখন বলি যে এইসব করে ও আমাকে আরও বেশি মায়ায় আবদ্ধ করে তুলছে। কয়েকদিন বাদেই তো ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তখন যে আমার বুকখানি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বিনা প্রতিবাদে ট্যাক্সিতে উঠে বসি। উর্বশী এথেন্সের পথ দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে ছুটে। আবার মনে পড়ছে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের কথা। সেই তাঁর দ্বিতীয়বারের পাশ্চাত্য ভ্রমণ, ১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে। কলকাতা থেকে 'গোলকোণ্ডা' জাহাজ ছেড়েছিল ২০শে জুন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।

সে যাত্রায় স্বামীজি কনস্তান্তিনোপল থেকে এথেন্স এসেছেন। স্বামীজি লিখেছেন—'বেলা দশটার সময় কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ। একরাত্রি একদিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden Horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপপুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীকধর্মের মঠ দেখলুম। এখানে পুরাকালে ধর্মশিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল—কারণ একদিকে এশিয়া আর একদিকে ইওরোপ। মেডিটেরেনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখতে গিয়ে প্রোফেসার লেপরের সহিত সাক্ষাৎ। পূর্বে পাচিয়াপ্পার কলেজে মান্দ্রাজে এর সহিত পরিচয় হয়। একটি দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখলুম—নেপচুনের মন্দির আন্দাজ, কারণ—সমুদ্রতটে।

সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌছলুম। এক রাত্রি কারানটাইনে থেকে সকালবেলা নাববার হুকুম এল। বন্দর পাইরিউস-টি (Peiraeus) ছোট শহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব ইওরোপের ন্যায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন ঘাগরা-পরা গ্রীক। সেথা হ'তে পাঁচ মাইল গাড়ী করে শহরের প্রাচীন প্রাচীর, যাহা এথেন্সকে বন্দরের

সহিত সংযুক্ত ক'রত, তাই দেখতে যাওয়া গেল। তারপর শহর দর্শন—আক্‌রোপলিস, হোটেল, বাড়ি-ঘর-দোর

অতি পরিষ্কার। রাজ-বাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আক্‌রোপলিস, বিজয়ার (Wingless Victory) মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। মন্দিরটিতে সাদা মর্মরের কয়েকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দণ্ডায়মান দেখলুম। পরদিন পুনর্বার মাদমোয়াজেল মেলকাবির সহিত ঐ সকল দেখতে গেলাম—তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয় দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের Eleusinian Mysteries অভিনয় এখানেই হত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি এক ধনী গ্রীক নতুন ক'রে দিয়েছে। Olympian games এর (অলিম্পিক খেলার) পুনরায় বর্তমান কালে প্রচলন হয়েছে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায় আমেরিকানরা অনেক বিষয়ে জেতে। গ্রীকরা কিন্তু দৌড়ে সে স্থান হ'তে এথেন্সের এই থিয়েটার পর্যন্ত আসায় জেতে। তুর্কের কাছে ঐ গুনের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিয়েছে। চতুর্থদিন বেলা দশটার সময় রুশী স্টীমার 'জার'—আরোহণে ইজিপ্ত যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জানলুম স্টীমার ছাড়বে ৪টার সময়—আমরা বোধ হয় সকাল সকাল এসেছি অথবা মাল তুলতে দেরী হবে। অগত্যা ৫৭৬ হ'তে ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বে আবির্ভূত এজেলাদাস (Ageladas) এবং তাঁর তিন শিষ্য ফিডিয়াস (Phidias), মিরন (Myron) ও পলিক্লেটের (Polycletus) ভাস্কর্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখুনি খুব গরম আরম্ভ। রুশিয়ান জাহাজে স্ক্রুর উপর ফার্স্ট ক্লাস। বাকি সবটা ডেক—যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ। এ জাহাজে আবার বরফও নেই।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা [ষষ্ঠ খণ্ড])

স্বামীজির কথা ভাবতে ভাবতে দেখছিলাম একালের এথেন্সকে

কি প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে বিগত এক শ' বছরে। কত উন্নতি হয়েছে তার।

কিন্তু না, আর ভাবনার অবকাশ পাই না। পাকা গাইডের মতো চন্দ্র বলে—এথেন্স মহানগরী আধুনিক অংশ মূলত জর্মন স্থপতিদের সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহারাজা অটো (Otto) যখন গ্রীসের নরপতি, তখন তিনি জর্মন ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে এথেন্সের কয়েকটি প্রধান পথ এবং কন্‌স্টিটিউশন ও কনকর্ড স্কোয়ার তৈরি করান। এসব করবার জন্য অবশ্য প্রচুর পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়েছে। এবং বাড়ি ভাঙার পালা চলছে তারপরেও, বহু-বছর ধরে। তারই ফলে এখন পথের পাশে এইসব আধুনিক বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। তবে শহরের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অংশে যদি বড় রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে চলে যান, তাহলে এখনও সেকালের সরু গলি আর তুর্কী আমলের বাড়ি-ঘর দেখতে পাবেন। অবশ্য সে আমলের কিছু কিছু বাড়ি আপনাকে রীতিমত আকর্ষণ করবে। বাসে চড়ে তাড়াতাড়ি চলে গেছেন বলে খেয়াল করেন নি, অ্যাক্রোপলিসের পথে এইরকম বেশ কিছু বাড়ি রয়েছে।

মনে পড়ে আমার। বলে উঠি—হ্যাঁ, হ্যাঁ। খেয়াল করেছি বৈকি! নিচের তলায় জানালা প্রায় নেই বললেই চলে। ওপর তলার ব্যালকনীগুলো রাস্তার ওপরে ঝুলে পড়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে পথচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে পথের সবটুকু দেখে নেওয়া যায়। বোধকরি তুর্কী মেয়েরা পর্দানশীল বলেই অমন বাড়ি তৈরি হয়েছিল।

চন্দ্র মাথা নাড়ে। তারপরে বলে—বাড়িগুলোর আরেকটা বৈশিষ্ট্য পেছন দিকে একফালি সবুজ বাগান। গরমের দিনে পর্দানশীল মেয়েরা যাতে পথচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটু হাওয়া খেতে পারেন।...

ট্যাক্সি থেমে যায়। চন্দ্র চুপ করে। পায়লট বলেন—'The Stoa of Attalus and the Ancient Agora.'

নেমে আসি গাড়ি থেকে। হাইওয়ের পাশে গাড়ি থেমেছে। পথের পাশে খালের মতো ড্রেন। ওপরে ছোট পুল। পুলের পরে

একটি কাঁকর বিছানো পথ। পথের পাশে ছোট-ছোট ফুল ও বড়-বড় গাছের ছায়াশীতল বাগান। বাগানের পরে প্রকাণ্ড লম্বা একটা দোতলা ব্যারাকবাড়ি। সামনে সারি সারি সাদা থাম আর ওপরে লাল চাল। পেছনে সাগর আর পাশে পাহাড়।

আমরা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াই। চন্দ্র বলে—স্তোয়া অব অ্যাটালুস।

—কি হয় এখানে ? সুপিন জিজ্ঞেস করে।

চন্দ্র উত্তর দেয়—কেনাকাটা। তার মানে এটা একটা বাজার। ডোরিক ও আইওনিয়ান স্তম্ভে সজ্জিত এই বাজারে প্রতি তলায় একুশখানি করে দোকানঘর রয়েছে।

বাজার এখানে সেকালেও ছিল. সুমহান দার্শনিক সক্রেতিসের আমলেও। তবে ঠিক এখানে নয়, ঐ পাহাড়ের গায়ে। চলুন, একটু এগিয়ে দেখা যাক।

কাঁকর বিছানো পথের শেষে একটা পায়েচলা চওড়া কাঁচাপথ। আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে পাহাড়টার মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। পাহাড়টা সামান্যই উঁচু আর তার ওপরটা প্রায় সমতল। অপরূপ অবস্থান, সামনে সমতল আর পেছনে সাগর।

পাহাড়টার ওপরে কোন লোকালয় দেখছি না। কেবল একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। মনে হচ্ছে বাড়িটা তিনটি মহল্লায় বিভক্ত ছিল। প্রতি অংশেরই সামনের দিকের স্তম্ভগুলি ও ছাদের কিছু অংশ রয়ে গিয়েছে। বাড়িটা বোধকরি শ্বেত পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। কারণ এখান থেকেও থামগুলো ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে।

লোকালয় রয়েছে পাহাড়টার গায়ে। বহু দোতলা-তিনতলা বাড়ি। নানা আকারের ছোট-বড় বাড়ি। একে পাহাড়, তার ওপরে পাশেই সাগর। জনপদ তো গড়ে উঠবেই। কিন্তু পাহাড়-টার ওপরে তো কোন নতুন বাড়ি দেখছি না।

—বাড়ি করতে দেওয়া হয় নি। কারণ পাহাড়ের ওপরটা পুরা-

তাত্ত্বিক বিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চল।

—কিন্তু ঐ বাড়িটাই কি সেকালের বাজার ছিল ?

—না, না। বাজার কাছাকাছি পাহাড়ের গায়ে কোথাও ছিল। তার কোন চিহ্ন নেই। তবে সেই স্মৃতিকে স্মরণ করেই এই নতুন স্তোয়া তৈরি করা হয়েছে। স্মৃতিটা ঐতিহাসিক। কারণ সুপণ্ডিত প্লাতোকে নিয়ে সুমহান সক্রেতিস নিয়মিত এখানে আসতেন। আর তাঁদের আকর্ষণে এখানে সমবেত হতেন শত শত ভক্ত ও শিষ্য। সক্রেতিস তাঁদের কাছে গল্পচ্ছলে তাঁর দার্শনিক সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতেন। সাগরের গর্জন আর বনের মর্মর সেই ঐশ্বরিক অধিবেশনে আবহসঙ্গীতের ভূমিকা পালন করত।

তার মানে এটি একটি মহাতীর্থ। সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম জানাই।

সহসা সুপিন বলে ওঠে—তাহলে পাহাড়ের ওপরে ঐ ভাঙা বাড়িটা কিসের ?

—ওটা ছিল এথেন্সের প্রাচীন অ্যাগোরা।

—কি হত ওখানে ?

—আইনসভা বসত, এথেন্সের পার্লামেণ্ট। সম্রাট অ্যাটালুস খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ঐ অ্যাগোরা নির্মাণ করেছিলেন। পাঁচ শ' সিনেটার ওখানে মিলিত হয়ে এথেন্সবাসীদের ভাল-মন্দ নির্দ্ধারণ করতেন। তবে ওখানে কেবল অ্যাগোরা ছিল না. ছিল অলিম্পাসের দ্বাদশ দেবতার মন্দির।...

কিন্তু চলো, এবারে ফেরা যাক। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, চলো।

চলতে চলতে চন্দ্র বলে—আমেরিকান স্কুল অব্ ক্লাসিকাল স্টাডিজ-এর গবেষকগণ এখানকার খননকার্য পরিচালনা করেছেন! এবং তাঁদের সযত্ন গবেষণার ফলেই অ্যাগোরার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমরা গাড়িতে উঠি। গাড়ি এগিয়ে চলে। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই আবার থেমে যায়। পায়লট বলেন—

Temple of Hephaestus

তাকিয়ে দেখি পথ থেকে খানিকটা দূরে সামান্য উঁচুতে একটা বেশ বড় পুরনো বাড়ি। চারিদিকে গোলাকার স্তম্ভের সারি। কড়ি-কাঠের ওপরে 'ফ্রীজ'—খোদাই কাজ। আর সামনের দিকে দোচালা ছাদের অংশটি ত্রিভূজাকৃতি। বাড়ির চারিদিকেই ফাঁকা জমি। ঝোপ-ঝাড় ও বড়-বড় গাছে বোঝাই। এক কথায় জঙ্গল হয়ে আছে। দেখে বেশ অবহেলিত মনে হচ্ছে।

অথচ চন্দ্র বলে—খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে নির্মিত এই মন্দিরটি গ্রীসের সবচেয়ে সংরক্ষিত (best preserved) প্রাচীন মন্দির। এর চৌত্রিশটি থামের প্রত্যেকটি এবং প্রায় সম্পূর্ণ ছাদটাই অক্ষত রয়েছে। বলা বাহুল্য এটাও ডোরিক মানে পার্থেননের মতো স্থাপত্যকলায় নির্মিত। ঐতিহাসিকগণ বলেন পার্থেনন এবং সউনিয়ন মন্দিরের স্থপতি ইক্‌তিনস (Ictinos) এই মন্দিরটিও নির্মাণ করেছেন। স্থপতি ইক্‌তিনসকে শত শত বছর ধরে থেসিয়ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ থেসিউসের বিভিন্ন বীরত্বের কাহিনীকে অবলম্বন করে প্রতিটি মন্দিরে তিনি ফ্রীজ খোদাই করেছেন।···

—আঙ্কল! তুমি কিন্তু এখনও থেসিউসের গল্প বলো নি।

চন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে মাঝখানে আমাকে মনে করিয়ে দেয় সুপিন।

তাড়াতাড়ি জবাব দিই—বলব বৈকি! নিশ্চয়ই বলব।

সুপিন আর কিছু বলে না। চন্দ্র বলে—চলুন, নেমে গিয়ে একবার দেখে আসা যাক।

ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে একটি পায়ে-চলা পথ। তাই দিয়ে উঠে আসি মন্দিরে। স্তম্ভ সিলিং ও ফ্রীজগুলো দেখি। সত্যই আশ্চর্য রকম অক্ষত। কি জানি বোধহয় পারসী, তুর্কী ও অন্যান্য আক্রমণ-কারীদের নজরে পড়ে নি।

একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে। আমি প্রায় আড়াই হাজার বছরের একটি পুরনো মন্দিরতলে বিচরণ করছি। সমাজ ও সভ্যতার সহস্র বিবর্তনের মাঝেও মন্দিরটা এখানে রয়ে গেছে। সক্রেতিস

আলেকজান্দার ও আর্কিমিদিস যে মন্দির দেখেছেন, আমি সেই একই মন্দির দর্শন করছি। আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

চন্দ্র বলে—হেফিস্তাস হলেন কামার ও কুমোরদের দেবতা। তিনি নাকি এই মন্দিরে বাস করতেন। কথাটা বোধকরি মিথ্যে নয়। কারণ এ অঞ্চলে বহুকাল ধরে কুমোর-কামারদের বসবাস ছিল। মানুষকে নিয়েই তো দেবতা।

আমি মাথা নাড়ি। চন্দ্র বলতে থাকে—খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই মন্দিরটি সেণ্ট জর্জ গীর্জায় রূপান্তরিত হয় আর তুর্কী আমলে এটিকে মসজিদ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই মন্দিরের জমিতে প্রোটেস্টাণ্টদের কবর দেবার প্রথা প্রচলিত হয়।

পায়লট গাড়ি ছাড়তেই সুপিন ফরমাশ করে—আঙ্কল এই ফাঁকে চটপট একটু সক্রেতিস আর প্লাতোর কথা বলে দাও তো!

না বললে নিস্তার নেই। তাই বিনা প্রতিবাদে বলি—নিশ্চয়ই বলব। তবে এখন নয়, হোটেলে ফেরার পথে।

সুপিন আর আপত্তি করে না। সে নীরব থাকে। গাড়ি এগিয়ে চলে।

একটু বাদে পায়লট বলে ওঠেন—'The Roman Agora—Tower of the winds.'

তাকিয়ে দেখি একটা কাঁচা-সড়কে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে কিছু সাধারণ পুরণো বাড়ি-ঘরের মাঝখানে একফালি পাথর বাঁধানো সমতল। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস। তারই মাঝে মাঝে কয়েক সারি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গোল থাম। কোনটি দু-তিন ফুট, কোনটিবা চার পাঁচ ফুট।

নেমে আসি পথে। চন্দ্রর দিকে তাকিয়ে সুপিন বলে—এবারে মিস্টার গাইড বলুন, এটা কি ব্যাপার?

ঠাট্টাটুকু নীরবে হজম করে চন্দ্র সেই থামগুলো দেখিয়ে বলে—রোমসম্রাট অগাস্টাস সীজার এখানে একটি চার থামওয়ালা তোরণ নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট হাড্রিয়ান তার চারিদিকে সমান-সমান

ব্যবধানে কয়েকসারি শ্বেতপাথরের স্তম্ভ তৈরি করে দিয়েছিলেন তাদেরই গোড়াগুলি কেবল রয়ে গেছে। এটাই রোমান অ্যাগোরা।

—আর টাওয়ার অব দা উইণ্ডস ?

—ওপাশে। চলো, দেখা যাক।

কয়েক পা হেঁটে সেখানে আসি। চন্দ্র বলে—খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে বায়ুপ্রবাহের এই দিঙনির্ণয় যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছিল। আর ছিল একটি সূর্যঘড়ি। তবে তুর্কীরা বলতেন, এখানেই তুজন দিব্য-প্রেরণাপ্রাপ্ত গ্রীক শিক্ষককে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

—তাঁরা কারা ?

—তুর্কীদের ধারণা, সক্রেতিস ও প্লাতো।

—সত্যি ?

—না হওয়াই সম্ভব।

আবার গাড়িতে এসে উঠি। একটু বাদে 'আর্চ অব হাদ্রিয়ান' এবং দেবরাজ জিউসের মন্দিরে আসি, নাতি প্রশস্ত একটা কাচা পথের তু-পাশে। বাঁদিকে হাদ্রিয়ানের আর্চ আর ডানদিকে জিউস মন্দির। তার পেছনে পাহাড়। পাহাড়ের পায়ের কাছে আর গায়ে ছোট-বড় অসংখ্য বাড়ি। আর পাহাড়ের ওপরে অ্যাক্রোপলিস, এথেন্সের সিংহাসন।

সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। রাতে যখন আলো জ্বলে, তখন তাকে উর্বশী এথেন্সের মধ্যমণি বলেও মনে হয়। কিন্তু এখন আর অ্যাক্রোপলিসের কথা নয়। আর্চ অব হাদ্রিয়ানকে দেখা যাক।

একটি ছোট ফটক ! তুদিকে পাথরের দেওয়াল ! তারই মাঝে অর্ধচন্দ্রাকার তোরণ। দরজার ওপরে চারটি গোল ও তুটি চৌকো থাম। সিলিঙের খানিকটা অংশও রয়ে গিয়েছে। তবে ওখানটা কেমন ছিল কিছুই বোঝা যাচ্ছে—না। কেবল একখানি বোর্ডে ইংরেজীতে লেখা—'This is the city of Hadrian.' অর্থাৎ পথের এই ডানদিকটায় ছিল হাদ্রিয়ান নির্মিত নগরী।

চন্দ্র যোগ করে—রোম সম্রাট হাদ্রিয়ান প্রথমে এখানে এই

করিন্থিয়ান স্তম্ভযুক্ত তোরণ তৈরি করেন। তারপরে অনেক বাড়ি-ঘর তৈরি করে, এই মহল্লার নাম দিয়েছিলেন 'সিটি অব্ হাড্রিয়ান।'

আমরা পথ পেরিয়ে জিউস মন্দিরে আসে। ভুল হল। মন্দির নেই এখন। আছে তার ধ্বংসাবশেষ তার মানে প্রকাণ্ড উঁচু এবং বেশ মোটা গোলাকার কতগুলো থাম।

এখানেও একখানি সাইনবোর্ড—'This is the City of Theseus'—তার মানে এদিকটা ছিল থেসিউসের নগরী অর্থাৎ প্রাচীন এথেন্স।

চন্দ্র মাথা নাড়ে। বলে—কিন্তু সম্রাট হাড্রিয়ানই দেবরাজ জিউস মন্দিরটির নির্মাণকার্য শেষ করেন। মন্দিরটি প্রায় ছ'শ' বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়েছিল।

হাড্রিয়ান নির্মিত মন্দিরটি ছিল তৎকালীন য়ুরোপের সবচেয়ে বড় মন্দির, লম্বায় ৩৫৪ ফুট ও চওড়ায় ১৩৫ ফুট। একশ' চারটি করিন্থিয়ান স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটি। তারই মাত্র ষোলটি এখন দেখতে পেলেন। আর কিছু নেই।

থামল চন্দ্র। আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারি না। কে বলে কিছু নেই। রয়েছে সেদিনের বৈভব আর সাধনার স্মৃতি, ভক্তি আর ঐশ্বর্যের ইতিহাস, ত্যাগ আর মহত্ত্বের গৌরবগাথা।

অতীতের সেই গৌরবময় এথেন্সের কথা ভাবতে ভাবতে এসে গাড়িতে উঠি। গাড়ি এগিয়ে চলে হোটেলের পথে।

একটু বাদে সুপিন মনে করিয়ে দেয়—আঙ্কল, এখন কিন্তু আমরা হোটেলে ফিরে চলেছি।

অতএব আরম্ভ করতে হয়—পাশ্চাত্য দর্শনের আদিপিতা সক্রেতিস। তাঁর সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৯ থেকে ৩৯৯ সাল। সক্রেতিস প্রথম জীবনে ভাস্কর ছিলেন, পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরি করতেন। সুতরাং পার্থেনন ও সউনিয়ন প্রভৃতি মন্দিরে হয়তো তিনি কাজও করে থাকবেন। তিনি বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম জ্যানথিপি।

শেষ পর্যন্ত তিনি ভাস্কর্য ছেড়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী হয়ে

পড়েন। এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এ অনুরাগ অবিচলিত থাকে।

গ্রীক সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সক্রেতিস। কিন্তু তিনি প্রথাগত শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। বক্তৃতা কিম্বা বই লিখে তিনি মতাদর্শ প্রচার করেন নি। আলাপ-আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়েই তিনি দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেছেন। যুক্তি দিয়ে কুসংস্কার দূর করে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। সেই সংগ্রাম কায়েমী সার্থকে আঘাত করেছিল। তার ওপরে আবার কিছু রাজদ্রোহী তাঁর মতাদর্শের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে সক্রেতিস জনতার আদালতে অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগ আনা হয়, তিনি যুবকদের বিপথগামী করে নতুন ঈশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। অভিযোগ স্বীকার করে সক্রেতিসকে ক্ষমা চাইতে বলা হল। সক্রেতিস সম্মত হলেন না। তিনি আপন মতাদর্শে অবিচলিত রইলেন।

বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। স্বেচ্ছায় হেমলক বিষের পাত্র হাতে তুলে নিয়ে সক্রেতিস অকৃতজ্ঞ ও কূপমণ্ডুক সমাজকে শেষ আঘাত হেনে জগতে অমর হয়ে রইলেন।

—বড় সংক্ষেপ করলে আঙ্কল! যাক্ গে প্লাতোর কথা বলো!

আমি শুরু করি—সক্রেতিস যন্ত্র, প্লাতো যন্ত্রী। সক্রেতিস অমর হয়েছেন কারণ তিনি প্লাতোর মধ্যে বেঁচে আছেন। সক্রেতিস নিজে কিছু লিখে যান নি, প্লাতোর রচনার মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাঁর কথা জানতে পেরেছেন।

প্লাতোর সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব ৪২৮ থেকে ৩৪৮ সাল। এই এথেন্স শহরেই এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন। সেনাবিভাগের সম্মানিত খেতাব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সক্রেতিসের সঙ্গে দেখা হবার পরই তাঁর জীবনের চাকা পথ পরিবর্তন করে। তিনি সক্রেতিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বহু চেষ্টা করেও প্লাতো তাঁর গুরুদেবকে বাঁচাতে পারলেন না।